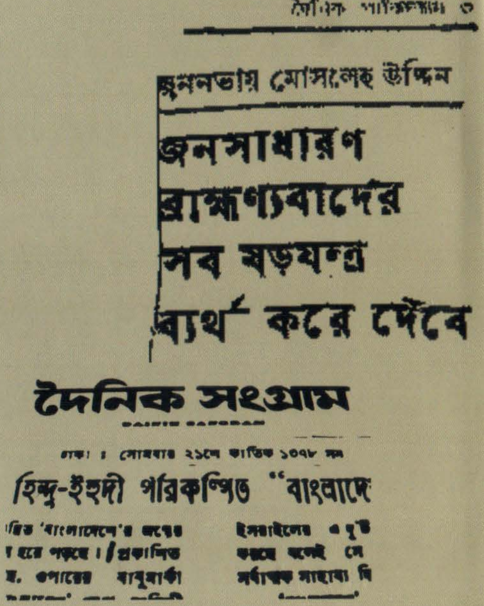


মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে এই জাতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সক্রিয় রয়েছে অদ্যাবধি। ২০১৩ সালে শাহবাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যে ক'জন তরুণ এই অবস্থার পরিবর্তনের শপথ নিয়েছিলেন সহুল আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম।

সহুলের জন্ম ১৯৯১ সালের ২৬ শে আগস্ট সিলেটে। ব্যক্তিগত জীবনে তার বাবা ব্যাবসায়ি এবং মা গৃহিণী। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে তিনিই বড়। শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করে এই বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ালেখা করছেন একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

ক্রমাগত মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বিভিন্ন প্রোপ্যাগান্ডার জবাব দিয়ে চলছেন বিভিন্ন ব্লগে, কাগজের পত্রিকায় এবং অনলাইন পত্রিকায়। নিয়মিত লিখছেন বিডিনিউজ, ইস্টিশন ব্লগ এবং সিলেটটুডে সহ নানা পত্রিকায় এবং ব্লগে। জড়িত আছেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান *মুক্তিযুদ্ধ-ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট* এবং ICRF-এর সাথে।

প্রচ্ছদ : অরূপ বাউল



দৈনিক পাকিস্তান ৩

মওলানা মোসলেহ উদ্দিন

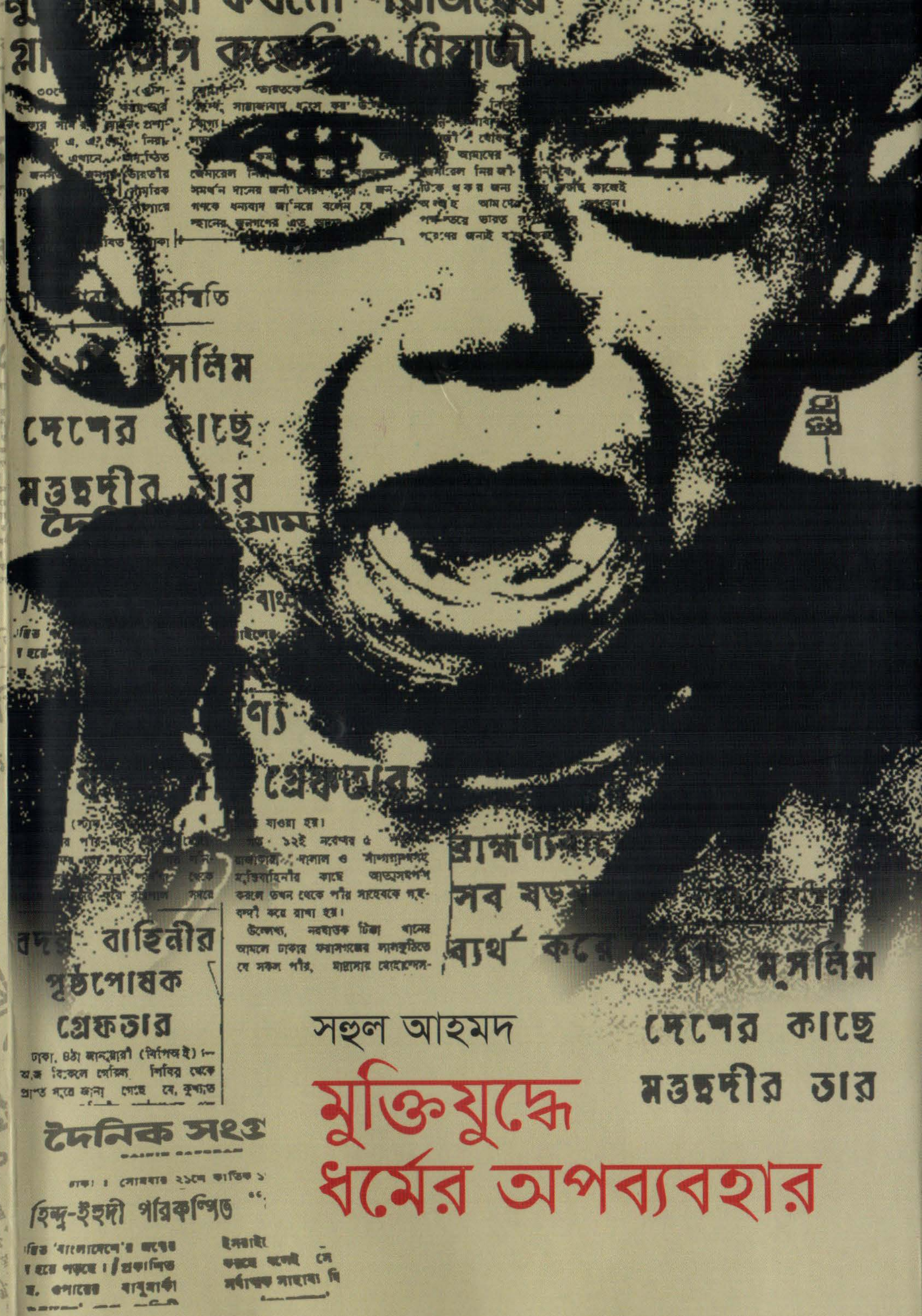
জনসাধারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে

দৈনিক সংগ্রাম

ঢাকা : সোমবার ২১শে কার্তিক ১৩৭৮ সন

হিন্দু-ইহুদী পরিকল্পিত "বাংলাদে

মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের অপব্যবহার ■ সহুল আহমদ



সহুল আহমদ

মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের অপব্যবহার

মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের অপব্যবহার
সহুল আহমদ

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
অরূপ বাউল

মূল্য ২৮০ টাকা / ১০ পাউন্ড / ১০ ডলার

প্রকাশক
আমার প্রকাশনী
মুক্তিযুদ্ধের বই, মুক্তচিন্তার বই
email: info@amarblog.com
web: www.amarprokashoni.com

Muktijudde Dhormer Opobebohar by Sohul Ahmed
published by Amar Prokashoni
March 2017; Price: BD 280 BDT, UK 10 GBP & US 10 USD.

উৎসর্গ

জননীদ্বয়

একজনের কাছ থেকেই শুনেছিলাম আরেকজনের জন্ম-ইতিহাস

সূচিপত্র

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সবচেয়ে ভয়াবহতম এবং নৃশংসতম গণহত্যার শিকার হতে হয়েছিল বাঙালিদের- স্বাধীনতার জন্যে এর চেয়ে কঠিন মূল্য আর কোন জাতিকে দিতে হয়েছে বলে মনে হয় না। লন্ডন টাইমসের মন্তব্যই যথার্থ If blood is the price of independence, then Bangladesh has paid the highest price in history"। তবে ১৯৭১ হঠাৎ করে আবিস্কার হওয়া কোন বছর নয় কিংবা হঠাৎ করেই গড়ে ওঠা কোন সংগ্রামও নয়, বরং দীর্ঘদিন থেকে চলমান মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিকতারই ফসল এবং এর এক চূড়ান্ত রূপ। সাতচল্লিশের পর থেকে শুরু হওয়া বাঙালি জাতীয়তাবোধের এই উন্মেষ রুখে দিয়ে বাঙালিদের পদানত করে রাখার মানসিকতা থেকেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানিরা শুরু করেছিল সে গণহত্যা যার নির্মমতা স্বয়ং নিয়াজীর কাছে হালাকু খাঁ ও চেঙ্গিস খানের নির্মমতার চেয়েও ভয়াবহ বলে মনে হয়েছে। রাও ফরমান আলী চেয়েছিল সবুজ বাংলাকে লাল বানিয়ে দিতে, এবং ইয়াহিয়া খানও বলেছিল তার শুধু মাটি চাই,মানুষ না।

যে কোন গণহত্যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে সুনির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীকে ধারাক্রমে নিঃশেষ করে দেয়া। আমরা জানি ২৫ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর এই নয় মাসে পাকিস্তানিদের হাতে ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছেন এবং চার-ছয় লক্ষ নারী নির্যাতিত হয়েছেন। তাদের এই হত্যাযজ্ঞ এবং ধর্ষণের প্যাটার্ন ও তীব্রতা খেয়াল করলে বুঝা যাবে পাকিস্তানি কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যার মূল উদ্দেশ্য এবং এর ব্যপকতা।

উল্লেখ্য, গবেষক রুমেল এই গণহত্যাকে নতুনভাবে নামকরণ করেছেন; তিনি একে বলেছেন 'ডেমোসাইড;- মানে রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকাণ্ড। বিংশ শতাব্দীকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডের শতাব্দী হিসেবে। এ শতাব্দীর ভয়াবহতম যে কয়টি ডেমোসাইডকে তিনি সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান দিয়েছেন সেখানে একাত্তরে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যাটাও আছে।

গণহত্যা চলাকালীন সময়ে কিংবা গণহত্যার পরবর্তীতে আক্রমণকারীরা কিছু উপাদান ব্যবহার করে তাদের হীন কর্মকাণ্ডের বৈধতা দানের জন্যে এবং হত্যাকাণ্ডে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই তারা

নিয়ে আসে কখনো ধর্ম, কখনো উগ্র জাতীয়তাবাদ কিংবা যে কোন ধরণের উগ্র মতবাদ। তবে, ধর্মের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি এবং সর্বাধিক কার্যকর, কেননা এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের একটা সহজাত আবেগ কাজ করে সবসময়। ১৯৯২ সালে রুয়ান্ডাতেও দেখা গিয়েছিল ধর্মের ব্যবহারের। প্রেসিডেন্টের ধর্মীয় পোশাক সম্বলিত ছবি দিয়ে পোস্টার ছাপানো, রাজনৈতিক সভাতে ঘন ঘন বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি, চার্চের সক্রিয় অংশগ্রহণ- এ সবই ছিল তুতসিদের বিপক্ষে প্রোপাগান্ডার জন্যে।

যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলেই ছিলে একধরণের সাম্প্রদায়িকতা তাই সেখানে ধর্মের ব্যবহারটাও ছিল ব্যাপক এবং কার্যকর। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং তাদের দোসরদের ধর্মের এরূপ রাজনৈতিক ব্যবহারের কিছু ঐতিহাসিক দলিল জোগাড় করেছি এখানে। পাকিস্তানি জেনারেলদের বইগুলোতে তাদের সাম্প্রদায়িক মন মানসিকতার সন্ধান মেলে, সেই সাথে তৎকালীন পত্র-পত্রিকা থেকেও পাওয়া যায় ধর্মের ব্যবহারের বিভিন্ন নমুনা। এখানে উল্লেখ্য, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বদরুদ্দীন উমরের 'সাম্প্রদায়িকতা'র সংজ্ঞাটাই ব্যবহার করা হয়েছে। সাম্পদায়িকতা, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এই শব্দগুলোকে তিনি যেভাবে আলাদা আলাদা করে সংজ্ঞায়িত করেছেন এর চেয়েও প্রকৃত সংজ্ঞা আর হতে পারে না।

এ বইয়ে মূল অধ্যায় আছে ছয়টা। প্রথমত পাকিস্তানি জেনারেল, শাসক ও তাদের রাজনীতিবিদদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মূল থেকেই তারা বাঙালিদের সম্পর্কে নিচু ধারণা পোষণ করত, যেমন তাদের চোখে বাঙালিরা সাচ্চা মুসলমান না, হিন্দু শিক্ষক ও ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাহিত নিচু জাতের লোক, কাফির, খাটি ইমানদার পাকিস্তানি না ইত্যাদি। শাসকগোষ্ঠীর এই ধরণের মন মানসিকতা গণহত্যাটাকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানিরা এত কম সময়ে এত বড় ধরণের হত্যাযজ্ঞ কখনোই সম্পূর্ণ করতে পারত না যদি না এই দেশেরই কিছু দালাল ধর্ম ও অখণ্ড পাকিস্তানের নাম করে তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগীতা করত। গণহত্যায় অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি দেশের ভেতরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক যাবতীয় ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিতে এই দালালরা রেখেছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা। একাত্তরকে জেহাদ ঘোষণা করে যুদ্ধবন্দি নারীদের গণিমতের মাল বলে আখ্যায়িত করে নারী ধর্ষণকে বৈধতা দেয়ার যাবতীয় কৌশল নিয়েছিল এই দালালরা। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা আছে তাদের নিয়ে।

এই পাকিস্তানি ও তাদের দোসরদের ধর্মের মিশ্রণে রাজনীতির মতবাদ প্রচার ও প্রসার করার জন্য ছিল তাদেরই কিছু পত্র-পত্রিকা। এখানে 'দৈনিক সংগ্রাম' এর

কথা উল্লেখযোগ্য। যেহেতু 'সংগ্রাম' প্রতিনিয়ত সে রকমের গণহত্যায় উস্কানিমূলক ভূমিকা রেখেছিল, এই পত্রিকা স্পষ্টতই তাই মানবতা-বিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত। পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি লিফলেট- পোস্টার এর মাধ্যমেও পাকিস্তানিরা 'জেহাদ'র ডাক দিয়েছে। ১৬/১২/২০১৫ তারিখে পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকা সে সময়কার এমন কিছু 'জেহাদি' পোস্টার এর ছবি প্রকাশিত করে। সেগুলোতেও ধর্মের প্রচ্ছন্ন ব্যবহার লক্ষ করা যায়; চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এ দিকে আলোকপাত করা চেষ্টা করেছি।

'পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ'- এই যুক্তি প্রদর্শন করে আজকাল প্রায়ই পাকিস্তানিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় এবং খেলার মাঠে বাঙালি ছেলেরা পাকিস্তানের পতাকাও নিয়ে চলে যায়। একাত্তরেও 'ইসলাম ও পাকিস্তান অভিন্ন'- এই সুর তুলে আমাদের ওপর নির্মমতা চালানো হয়েছে। কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন, আমরা ছোটকালে আমাদের পিতামাতাদের কাছ থেকে যে ইসলামের পরিচয় পেয়েছি সেটার সাথে পাকিস্তানি ও তাদের দোসরদের প্রচারকৃত ইসলামের দূরত্ব যোজন যোজন। আমরা যে ইসলাম ধর্মকে চিনি ও জানি তার নিরিখে একাত্তরে নিজামী-গোলাম আযমদের ধর্ম (!) রক্ষার কাজটাকে একটু পরখ করে দেখা হয়েছে ৬ষ্ঠ পর্বে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত কিছু বই এবং নিজামীর রায় থেকে এই পর্বের জন্য সাহায্য নেয়া হয়েছে।

সবশেষে "গণহত্যা' নিয়ে কিছুটা আলোনা করা হয়েছে।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একাত্তরে পাকিস্তানি ও তাদের দোসরদের ধর্মের ব্যবহারের মাত্রা ছিল ব্যাপক এবং এর প্রভাবও ছিল মারাত্মক। পরবর্তীতে রাজাকার ও আলবদর নেতাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল এই ধর্মের ব্যবহারের মাধ্যমেই। পুরোটা বিষয় তুলে আনা সম্ভব হয় নি বিভিন্ন কারণেই। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সে সময়ের পর্যাপ্ত পরিমাণ পত্র-পত্রিকা জোগাড় করতে সক্ষম হইনি। যদ্দুর পাওয়া গিয়েছে সেটাতেই অবশ্য ধরা পড়েছে তাদের যাবতীয় অপকর্ম। তারপরও সে সময়ে রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠানসমূহের ধারাবিবরণী এবং পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্রিকার কপি পাওয়া গেলে হয়তোবা এই কাজের পরিধি আরও বাড়ানো যেত; সে কাজ তুলে রাখলাম ভবিষ্যতের জন্যে।

অসীম কৃতজ্ঞতা আরিফ রহমান, কবির য়াহমদ, সাব্বির হোসাইন, নিঝুম মজুমদার এবং অরূপ বাউল এর প্রতি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রসারিত হাতের জন্যে!

পরিশেষে, বই সম্পর্কে যে কোন মতামত, ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক, সবই জানাতে পারেন নির্দ্বিধায়।

সহুল আহমদ
sohul.munna@yahoo.com

একাত্তরের পূর্বে

"লুঙ্গি উঁচা করিয়া দেখাইতে হইবে আমরা মুসলমান কি না?"

১

ক্রুসেড কিংবা ধর্মযুদ্ধে ক্রুশের সঙ্গে ঈদের চাঁদের সংঘাত চলেছিল প্রায় দেড়শ বছরের অধিক। এই ধর্মযুদ্ধের ফলাফল হল লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান ও মুসলমানের মৃত্যু এবং দুর্গতি, এশিয়া মাইনর ও প্যালেস্টাইন রঞ্জিত হয়েছিল রক্তের স্রোতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উগ্র জাতীয়তাবাদ একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর (ইহুদি) প্রতি তৈরি করেছিল সীমাহীন ঘৃণা, ফলস্বরূপ পৃথিবী আবার লাল হয়েছিল নিরীহ মানুষের রক্তে। তবে ১৯৭১ এ পাকিস্তানিদের ধর্মের ব্যবহার যেমন ক্রুসেডের মতোও না, আবার তেমন নাৎসিদের মতোও না। তাদের ঘৃণা ছিল বাঙালি জাতটার প্রতি; তাদের ফায়দা হাসিলের জন্যে এবং গণহত্যাটাকে জায়েজীকরণের জন্যেই খুব কৌশলে ব্যবহার করেছে ধর্মকে।

১৯৪৭ এ জিন্নাহর স্বপ্নের পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং তখনই বাঙালি প্রথম শিকার হয়েছিল ধর্মের নামে বীভৎসতার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে মানুষকে চালিত করে রক্তের গঙ্গা ভাসিয়ে আখেরে বৃহত্তর আর্থিক ও রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছিল তখনকার সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত। তবে এমন অভিজ্ঞতা বাঙালিদের জীবনে সেটা ছিল সবে শুরু। দেশভাগের পূর্বে মূলত ধর্মের এই নির্দিষ্ট ব্যাবহার ছিল অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে, কিন্তু পরবর্তীতে সেটাকে ব্যবহার করা হয় নিজ সম্প্রদায়েরই অধিকাংশের কণ্ঠ রোধ করতে।

বাঙালি তথা এই উপমহাদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি বেশ প্রবল; তাদের এই অনুভূতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজনীতিবিদরা বারবার তাদেরকে রাস্তায় নামিয়েছে, তাদের আবেগ দিয়ে রাজনীতি করেছে, ধর্মীয় ব্যবসা করেছে। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, বাঙালি মুসলমানরা জিন্নাহর স্বপ্নের পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল শুধুমাত্র ধর্মের অনুরাগেই নয়, সেখানে ছিল আরও কিছু কারণ।

'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে মল্লিক ও হোসেন বলেন, "উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে জনসংখ্যার অবস্থানগত বাস্তবতা এখানকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, যেখানে হিন্দুরা ছিল প্রায় সকল সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং মুসলমানরা ছিল ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে

বঞ্চিত। ... ... ১৯৪৬ সালে বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে একচেটিয়াভাবে ভোট দিয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য নয়, বরং, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, যা হিন্দু শাসিত ভারতে অর্জন করা অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়েছিল"।

অবশ্য এ বিষয়ে সরদার ফজলুল করিম ১৯৭২ সালে লেখা এক প্রবন্ধে খুব চমৎকারভাবেই বলেছিলেন, "বাংলাদেশ ইতিহাসের নির্যাতিত দেশ। কৃষক প্রধান দেশ। আবহমান কাল থেকে সে অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। জমিদারের হাতে। জোতদারের হাতে। মুক্তি চেয়েছিল সেই মানুষ এই অত্যাচার থেকে। স্বাধীন হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের নিজস্ব শ্রেণির চেতনা ও সংগঠনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামন্তবাদী নেতারা বুঝিয়েছিল- হিন্দু তোমাদের শত্রু। তোমরা মুসলমান। নির্ভেজাল মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই তোমরা মুক্তি পাবে। বাংলাদেশের মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিল। ঠিক আছে। জমিদার, জোতদার, মহাজনের অত্যাচার থেকে 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' বললে যদি আমরা মুক্তি পাই, তবে আমরা বলছি মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ। মুসলিম লীগের আওয়াজ তুললে যদি জমি পাই তবে তুলছি সেই আওয়াজ। বলছি - নারায়ে তাকবীর "

এরপর থেকে শাসকরা বাঙ্গালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুব কৌশলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মকে কাজে লাগিয়েছে। দেশভাগের পর থেকে ৭১ পর্যন্ত এই সময়টাতে ধর্মের ব্যবহারে পাকিস্তানিদের কিছু নির্দিষ্ট কর্মপন্থা লক্ষ করা যায়।

ক) সবকিছুতেই হিন্দুয়ানির গন্ধ পাওয়া এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো।
খ) পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে কাফের কিংবা হিন্দুর দালাল আখ্যায়িত করা।
গ) রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ইসলামের নামে নিজের ইচ্ছামত ফতোয়া প্রদান, এবং
ঘ) ইসলাম ও পাকিস্তানকে একে অন্যের পরিপূরক করে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করা।

২

বাঙালি মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষার সমস্যা পাকিস্তান আমলের চাইতেও পুরনো। পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা এই বাংলাকে নিজের মাতৃভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সরদার ফজলুল করিমের মতে, পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রের উচ্চতর শ্রেণির আশংকা ছিল বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা নিম্ন শ্রেণিকে সচেতন করে তুলবে যা তাদের আধিপত্য বিপন্ন

করতে পারে। ফলে সেদিনও, মানে দেশভাগের পরবর্তীতেও রাষ্ট্রের উঁচু শ্রেণীর এই বিপন্নতার ভয় পরিলক্ষিত হয় উর্দূর পক্ষে উর্দূর আভিজাত্য, উর্দূ ধর্মীয় ভাষা, ইসলামী সংস্কৃতির বাহন ইত্যাদি যুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আমাদের জাতীয় জীবনে ভাষা প্রশ্নে বাঙালির অনমনীয় মনোভাব ও দীর্ঘ আন্দোলনের ফল ও প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তবে উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষার পক্ষে কিংবা বাংলার বিরোধিতার অস্ত্র হিসেবে শুধু ধর্মকে ব্যবহার করার মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক মনোভাব শুরুতেই পরিষ্কার হয়ে যায়। যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করছে তারা ইসলামের শত্রু এ ধরণের প্রচার তখন চলতে থাকে সর্বত্র। সিলেট শহরে সে সময় আলেম সমাজ তারিখ-বিহীন এক প্রচারপত্রে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনার দীনি ফরজ সর্বত্র সভা সমিতি করিয়া উর্দূর সমর্থনে জনমত গঠন করা ও উর্দূ বিরোধীদের ফেরেববাজি হইতে মুসলিম জনসাধারণকে রক্ষা করা।"

উর্দূর পক্ষে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও একই ধরণের মতবাদ প্রচার করতে থাকে বিরামহীনভাবে। ১৯৪৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর *মর্ণিং নিউজ* এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে উর্দূর পক্ষে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাজির করে। এই দীর্ঘ সম্পাদকীয় সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেন, এর মূল বক্তব্য পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এতদিন হিন্দু সংস্কৃতির আওতায় ছিলো এবং সেই আওতামুক্ত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি গঠন করতে হলে ইসলামী সংস্কৃতিই তার মূল অবলম্বন হওয়া উচিত। আর তাই প্রয়োজন উর্দূ ভাষার। ধর্মের অজুহাতে দিয়ে যে সকল পত্রিকা বাংলা ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল তন্মধ্যে *মাসিক মোহাম্মদী* উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়; বিরোধী দলের পক্ষ হতে দুটো প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়; এর মধ্যে দ্বিতীয়টি ছিল ভাষা বিষয়ক। উর্দূ ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের এই প্রস্তাব করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অধিবেশনের তৃতীয় দিনে (২৫ ফেব্রুয়ারি) এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান শুধু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হলেন না, সরাসরি ধীরেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করতে গিয়ে যে উক্তি করেন সেটাতে তার সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। লিয়াকত আলী খান বলেন, 'প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য'।

সেদিন এই প্রস্তাবের বিরোধীতাকারীদের সকলেই তাদের বক্তৃতায় ধর্ম প্রসঙ্গ বারবার টেনে এনেছিলেন। মোহাজের ও পুনর্বাসন মন্ত্রী গজনফর আলী খান তখন

উর্দূর সাথে ইসলামের সম্পর্ক উল্লেখ করে স্পষ্টভাবেই বলে দেন, "উর্দূ কোন প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা। এবং উর্দূ ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি।"

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা আসেন এবং ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি বক্তৃতা দেন। দীর্ঘ এক ঘন্টাব্যাপী সে বক্তৃতাকালে ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '...পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করতে না পেরে, পরাজয়ের দ্বারা বাধাগ্রস্ত ও হতাশ হয়ে পাকিস্তানের শত্রুরা এখন মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্রাদেশিকতার উস্কানি দানের মাধ্যমেই তাদের এই প্রচেষ্টাকে তারা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, চৌদ্দশো বছর পূর্বে আমাদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল আমরা কি তা ভুলে গেছি? আমার মতো আপনারা সকলেই এখানে বহিরাগত। বাংলা দেশের আদি অধিবাসী কারা? যারা এখন এদেশে বাস করছে তারা নয়। কাজেই আমরা বাঙালি বা সিন্ধি বা পাঠান বা পাঞ্জাবি এ কথা বলার প্রয়োজন কি। না, আসলে আমরা সকলেই হলাম মুসলমান। এ কথা আমি পূর্বেই বলেছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে'।

উপরের বক্তৃতায় উর্দূর পক্ষে জোরালো কোন যুক্তি না দিয়ে বরং মুসলমান ও ইসলাম বিষয়টাই তুলে ধরেছেন। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের জন্যেই ভাষা আন্দোলন-উক্তির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তিনি হিন্দুদেরকেই দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। পরবর্তীতে, ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যে ভাষণ দেন সেখানেও ভাষার প্রশ্নে তিনি উর্দূর পক্ষে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা বলেন।

১৯৪৭ সালে তমুদ্দন মজলিশ "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ?" নামে যে পুস্তিকা প্রকাশ করে সেখানে কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্বপাকিস্তানের ভাষা সমস্যা" শিরোনামের প্রবন্ধে উর্দূর প্রতি কেন কিছু কিছু বাঙালির মোহ কাজ করত, সে মোহ কি কি সমস্যা তৈরি করছে এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় কি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কবি আলাওল, দৌলত কাজী দিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন *বাংলা হিন্দুদের ভাষা* ধরণের যুক্তিকে খণ্ডনের জন্যে। ধর্মের সাথে ভাষার এরূপ মিশ্রণ কিভাবে আমাদের বিপথগামী করছে সেটাও উল্লেখ করে বলেন, 'পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আড়ষ্টতার আরও দুটি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা এবং দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষার সম্পর্কিত মনে করে উর্দূ ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ। ...আমি উর্দূ ভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু বাঙালি মুসলমানের উর্দূর মোহকে সত্যসত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন দেখি, উর্দূ ভাষার একটা অশ্লীল প্রেমের গান

শুনেও বাঙালি সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে মাতোয়ারা, অথবা বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসংগীতও হারাম বলে নিন্দিত, তখনই বুঝি এই সব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই'।

এমনকি এই ধর্মের অজুহাতে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলন করার উদ্যোগও নেওয়া হয়। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের এমনতর ষড়যন্ত্রের জবাবে যিনি সবচেয়ে সবচেয়ে বেশী জোরালো ছিলেন তিনি হলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ভাষাবিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে নিয়মিত জবাব দিচ্ছিলেন বাংলার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগের - সেটা ধর্মীয় হোক আর আরবি হরফ সংক্রান্ত হোক। আরবি ভাষাকেই আমি বিশ্বের মুসলমানদের জাতীয় ভাষারূপে গণ্য করি- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সে সময় এমনও উক্তি করেছিলেন, তবে সেটা আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য নয়, বরং উর্দূ ইসলামী ভাষা, ইসলামী ঐতিহ্য বহন করে, মুসলমানদের ঐক্যের জন্যে উর্দূর প্রয়োজন এই যুক্তিগুলোর ভিত্তিহীনতা প্রমানের জন্য। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। যা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি লুঙ্গি দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই"।

১৯৫০ সালে *সাপ্তাহিক সৈনিক* পত্রিকায় কার্টুন ছাপা হয়েছিল। এই ছবিটাই সে সময়ের অনেক কিছুই বলে দেবে।



আটচল্লিশে জিন্নাহর ভাষণের প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের রক্তঝরা ২১ ফেব্রুয়ারির কল্যাণে ১৯৫৬ সালেই পাকিস্তানি শাসকরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি, শুধু আন্দোলনের রূপ ও রঙ বদলে গিয়েছিল। সরকার তখন অন্যভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগলো এবং এরই

প্রেক্ষিতে আবারো সামনে নিয়ে আসলো ধর্মকে। ইসলামপন্থী কবি লেখদের মাধ্যমে প্রচুর আরবি, ফারসি শব্দের আমদানি করা হলো সাহিত্যে শুধুমাত্র বাংলাকে মুসলমানি চেহারা দেয়ার অভিপ্রায়ে। সরকারী উদ্যোগে ঢাকায় দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে তখন; *মাহে নও* এবং *এলান*। ধীরে ধীরে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন *উজীরে আলা* এবং প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন *উজিরে আজম*।

রবীন্দ্রনাথকে সে সময় ঘোষণা করা হলো হিন্দু কবি হিসেবে, চিহ্নিত করা হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে। এমনকি তাদের সে শুদ্ধি অভিযানের হাত থেকে কাজী নজরুল ইসলামও রেহাই পাননি। নজরুলের কবিতার হিন্দুয়ানি শব্দ বাদ দেয়ার উদ্যোগ নেয় হয়। *নব নবীনের গাহিয়া গান, সজিব করিব মহাশশ্মান* লাইনটাকে পুরোপুরি পছন্দ হয়নি তাদের। *মহাশশ্মান* শব্দটাকে বাদ দিয়ে এখানে বসিয়ে দেয়া *গোরস্থান*; "সজিব করিব গোরস্থান"।

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি'– এই কবিতায়ও যথেষ্ট পরিমাণ ইসলামী শব্দ না থাকায় এটার পরিবর্তে লেখা হলো:
'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি
সারাদিন আমি যেন নেক হয়ে চলি'

১৯৬৭ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেন, "রবীন্দ্রসংগীত প্রচার রেডিও থেকে প্রায় কমিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে না মিললে বন্ধ করে দেয়া হবে"।

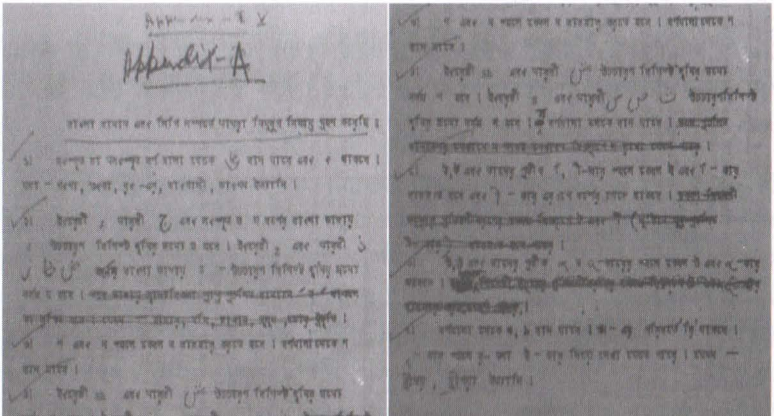
দৈনিক আজাদ তখন লিখে, "পাকিস্তান ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট কর্মসূচি লইয়া দুনিয়ার বুকে জন্মলাভ করিয়াছে। আমরা পাকিস্তানিরা তাই স্বকীয় তাহজীব তমুদ্দনের পরিপন্থী কোন প্রচেষ্টাই বরদাশত করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বহু সংগীতে মুসলিম তমুদ্দনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতি জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সংগীতের আবর্জনা হইতে রেডিও টেলিভিশনকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল। তাই বিলম্বে হইলেও সরকার এই সংগীত পরিবেশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া জনগণের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।"

এর বিরুদ্ধে তখন ১৮ জন বুদ্ধিজীবী একসাথে বিবৃতি দিয়েছিলেন যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২৫ জুন দৈনিক পাকিস্তানে। শিরোনাম ছিল *রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের বিরোধীতা*। ২৮ জুন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও এর প্রতিবাদে দৈনিক পাকিস্তানে বিবৃতি দেন।

"রেডিও পাকিস্তান হতে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনা সম্পর্কে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার নিম্ন লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন। তথ্যমন্ত্রী জনাব শাহাবুদ্দিন ঘোষণা করেছেন যে, রবীন্দ্র সংগীত ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐতিহ্য পরিপন্থী বিধায় আর বেতার ও টেলিভিশন মারফত পরিবেশিত হইবে না... রবীন্দ্রনাথের অবদান সার্বজনীন। ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জন্য ঘোষণা করেছেন। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই যারা ইসলামের নামে রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন তারা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দর নীতিতে বিশ্বাসী নন"।

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান আরবি হরফে বাংলা ও উর্দূ লেখার সুপারিশ করেন। ১৪ আগস্ট দৈনিক পাকিস্তান এই সংক্রান্ত খবর ছাপায়। মুসলমান মাত্রই আরবি ভাষার প্রতি দুর্বলতা কাজ করে, ঠিক এই আবেগটা নিয়ে এখানে নড়াচড়া শুরু করেছিলেন তখনকার শাসকেরা।

১৯৬৮ সালের দিকে আইয়ুব খান যুক্তি দেখালেন, দু' অঞ্চলের সংহতি বৃদ্ধির খাতিরেই একটি ভাষা দরকার। উর্দূ আর বাংলা মিলিয়ে এই ভাষা হবে। বাংলা একাডেমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ প্রস্তাব প্রণয়নের প্রচেষ্টাও করা হয়।


Appendix-A

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্ষদের ৩ আগস্ট ১৯৬৮ সালের সভায় বাংলা ভাষা সংস্কারের সিদ্ধান্ত সমূহ। ছবিটা "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস", বশীর আল হেলাল এর বই থেকে নেয়া হয়েছে]

৩

ধর্মের এই ব্যবহার শুধুমাত্র বাংলা ভাষা কিংবা বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই ছিলনা, বরং, সর্বক্ষেত্রেই তা চলছিল। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে নেয়া হয় এই ধর্মকে। ১৯৫২ সালের দিকে গভর্নর মালিক ফিরোজ খান নুন বাঙালিদের নিয়ে তীর্যক মন্তব্য করে বলেছিলেন, "বাঙালি মুসলমানরা অর্ধেক মুসলমান এবং তারা মুরগির মাংস হালাল করে খায় না"। এমন অপমানসূচক কথার জবাবে মাওলানা ভাসানী তখন প্রবল আক্রোশের সাথে উত্তর দিলেন, "লুঙ্গি উঁচা করিয়া দেখাইতে হইবে আমরা মুসলমান কি না?"

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস The Rape of Bangladesh গ্রন্থে এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করেন: "I found on my visit to the 9 Division Headquarters in Comilla Punjabi officers unceasingly questioning the loyalty of the Bengalis to Islam. They denounced them as Kafirs (unbelievers) and Hindus, their real sin being support of Bengali nationalism against West Pakistani domination."

"কুমিল্লার নবম ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে আমার সফরকালে আমি দেখেছি পাঞ্জাবি অফিসারগণ বাঙালিদের ইসলামের আনুগত্যের প্রতি সবসময়ই সন্দেহ পোষণ করত। তারা বাঙালি মুসলমানদের কাফের ও হিন্দু বলতো"।

রাজনীতির মাঠেও অবিরাম চলতে থাকে ধর্ম নিয়ে এই ধরনের খেলা, তবে এখানে এক নতুন জিনিসের সংযোজন ঘটে। আলেম- মাওলানা -পীরদের প্রতি বাঙালি মুসলমানদের অগাধ বিশ্বাস এবং আমাদের বিরাট এক অংশ এই মাওলানাদের দ্বারা প্রভাবিত। মুসলিম লীগের নেতারা তখন টাকা দিয়ে বড় বড় আলেম, পীর ও মাওলানাদেরকে দলে টানতে লাগলেন এবং তাদেরকে দিয়ে ফতোয়া দেওয়ানো শুরু করলেন। এরকম ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"তে, "জামান সাহেব ও মুসলিম লীগ যখন দেখতে পারলেন তাদের অবস্থা ভালো না, তখন এক দাবার ঘুঁটি চাললেন। অনেক বড় বড় আলেম, পীর ও মাওলানা সাহেবদের হাজির করলেন। গোপালগঞ্জে আমার ইউনিয়নে পূর্ব বাংলার এক বিখ্যাত আলেম মাওলানা শামসুল হক জন্মগ্রহণ করেছেন। মাওলানা সাহেব ইউনিয়নের পর ইউনিয়নে স্পিডবোট নিয়ে ঘুরতে শুরু করলেন এবং এক ধর্মসভা ডেকে ফতোয়া দিলেন আমার বিরুদ্ধে যে, আমাকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। সাথে শর্ষিণার পীর সাহেব, বরগুনার পীর সাহেব, শিবপুরের পীর সাহেব, রহমতপুরের পীর সাহেব সকলেই আমার বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন এবং যত রকমের ফতোয়া দেয়া যায় তাহা দিতে কৃপণতা করলেন না"।

তবে এত কিছুর পরেও সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্মের সবচেয়ে বড় ব্যবহারটা করা হলো অন্য জায়গায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। সেনাবাহিনীকে শুরু থেকেই

একটা প্রোপ্যাগান্ডার মাধ্যমে জনগণের কাছে 'মহান' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এবং জিয়াউল হকের সময় থেকেই আসলে সেনাবাহিনীতে ধর্মের ওপর জোর দেয়া শুরু হয়। তখন প্রতিটি ইউনিটে ইউনিটে ইমান, তাকওয়া, জিহাদ ও ফি সাবিলিল্লাহ এর উপর বক্তৃতা দেয়া হত। তার এমন প্রচারের ফলেই পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ভাবমূর্তিকে ইসলামী বলে চালানো সম্ভব হয়। সেই সাথে জান্তার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই এ দিকটায় আরো বেশী করে জোর দিলেন। ১৯৬৫ সালের দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তাদের শৌর্য বীর্যের কথা এত বেশী প্রচার হওয়া শুরু হয় যে তখন তাদের নিয়ে কিছু গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এ প্রচারণায় তখন যুক্ত করা হয় নতুনভাবে ধর্মকে। সেনাবাহিনী এত বীরত্বের সাথে লড়েছিল কেননা তারা মুসলমান, তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছে। সেনাবাহিনী হয়ে উঠে The Ultimate Sanction behind the creation of Pakistan. এরপর থেকে যখনই কেউ পাকিস্তান জান্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে গিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়েছে- এমন সবাইকে তখন আখ্যায়িত করা হত ইসলামের শত্রু বলে, হিন্দুদের দালাল বলে। ইসলাম বিপন্ন বলে তখন শুরু হয়ে যেত প্রচারণা এবং ইসলামকে রক্ষা করতে সবার প্রতি আহ্বান জানানো হত। ধর্মের প্রতি প্রবল অনুভূতি সম্পন্ন বাঙালি তখন শাসকদের পাতানো এই ফাঁদে পা দিত।

আইয়ুবের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে পূর্বসূরির পথ ধরেন। তাঁর তথ্যমন্ত্রী জেনারেল শের আলী তখন পাকিস্তানের সেই ইসলামিক আদর্শের কথা জপতে শুরু করলেন। জামায়াতে ইসলামী তখন পাকিস্তানের *আইএসআই*র সহযোগিতায় পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে দুটো পত্রিকা বের করা শুরু করে: করাচী থেকে *দৈনিক মুসাওয়াত* এবং ঢাকা থেকে *দৈনিক সংগ্রাম*। এই *সংগ্রাম* একাত্তরে পাকিস্তানিদের সবচেয়ে বড় প্রোপ্যাগান্ডা চালিয়েছিল এবং ধর্মকে সর্বাধিক নগ্ন উপায়ে ব্যবহার করেছিল, পরবর্তীতে এই বিষয়ে আলোকপাত করব।

১৯৭০ এর নির্বাচনেও জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগকে ধরাশায়ী করতে আবারো আশ্রয় নেয় ধর্মের। মাসকারেনহাস লিখেন, "পূর্ব বাংলার অসংখ্য মসজিদে মোল্লাগন জামায়াতে ইসলামীর লাগামহীন ভণ্ডামির পক্ষে কর্কশ ভাষায় যে অভিযান চালাচ্ছিলো, তা শাসক কর্তৃপক্ষকে নতুনভাবে উৎসাহিত করেছিল"।

বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসক ও মুসলিম লীগের নেতাদের ধর্মের এমনতর ব্যাবহারে কিছু সংখ্যক বাঙালি প্রভাবিত হয়েছিল ঠিকই, তবে তারা বারে বারে ভুলে যাচ্ছিল এক চিরন্তন সত্যের কথা। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী কংগ্রেসের মাওলানা আজাদ বলেছিলেন, "আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মি জিন্নাহর দৃষ্টি এড়িয়ে

গেছে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ। তিনি জানেন না, বাংলাদেশ বাইরের কোন নেতৃত্ব মেনে নেয় না। আজ কিংবা কাল তারা সে নেতৃত্ব অস্বীকার করবে। বাংলাদেশের পরিবেশ এমনই যে, বাঙালিরা বাইরের নেতৃত্ব অপছন্দ করে এবং তখনই বিদ্রোহ করে, যখন দেখে যে তাদের অধিকার বা সুযোগ সুবিধা বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে।"

এটাই সেই চিরন্তন সত্য।

তথ্যসুত্রঃ

১) পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি - বদরুদ্দীন উমর
২) The Rape of Bangladesh - অ্যান্থনী মাসকারেনহাস
৩) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ দ্বিতীয় খন্ড
৪) প্রবন্ধ সমগ্র - সরদার ফজলুল করিম
৫) মুক্তিযুদ্ধ ও তারপরঃ একটি নির্দলীয় ইতিহাস - গোলাম মুরশিদ
৬) মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ - মুনতাসীর মামুন
৭) অসমাপ্ত আত্নজীবনী - শেখ মুজিবুর রহমান
৮) ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস - বশীর আল হেলাল
৯) মাওলানা আজাদের সাক্ষাৎকার, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
১০) পাকি জেনারেলদের মন - মুনতাসীর মামুন
১১) ভাষা আন্দোলনে সিলেট - তাজুল মোহাম্মদ
১২) চল্লিশ থেকে একাত্তর - এম আর আখতার মুকুল

পাকি মন

–'হাম কুত্তা নেহি হ্যাঁয়, হাম মুসলমান হ্যাঁয়।'
–'তোম যো মুসলমান হ্যাঁয় উ তো ভোল গিয়া।'
(রাইফেল রোটি আওরাত)

১

গণহত্যা যেহেতু একটা Systematic Killing, তাই এটা কিছু ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়ে থাকে। গবেষকরা এমন আটটা ধাপকে চিহ্নিত করেছেন, যেমনঃ ১.Classification, ২. Symbolization, ৩. Dehumanization, ৪. Organisation, ৫. Polarization, ৬. Preparation, ৭. Extermination, ৮. Denial। এই ধাপগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা আছে "*গণহত্যা অস্বীকার গণহত্যারই অংশ*" নামক প্রবন্ধে।

এখানে Preparation কিংবা প্রস্তুতিরই একটা অংশ হচ্ছে Identification। Identification greatly speeds the slaughter। ভিকটিমদের তালিকা তৈরি করা হয়, বাড়ি ঘর চিহ্নিত করা হয়, ম্যাপ তৈরি করা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। রুয়াভায় সবার পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করে হয়েছিল যেন সহজেই তুতসিদের চেনা যায়। এই আইডি কার্ড ছুড়ে ফেলে দিলেও কাজ হত না, হুতু হিসবে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে না পারলে তুতসী বলেই ধরে নেয়া হত। এই পরিচয়ের ক্ষেত্রে ২য় ধাপ (Symbolization) এর ভূমিকা ব্যাপক। পাকিস্তানিরা ছিল হিন্দু বিদ্বেষী, হিন্দুদের উপর তাই প্রকোপও পড়েছিল বেশী। তাই হিন্দু নারীরা তখন মাথার সিঁদুর মুছে ফেলত, পুরুষরা মাথায় টুপি পরত, ধুতির বদলে লুঙ্গি পরত। পাকিরা "চার কলেমা"র মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম যাচাই করতো; কেউ বলতে না পারলেই গুলি করে হত্যা করা হত। কখনো কখনো লুঙ্গি খুলে পরীক্ষা করতো হিন্দু না মুসলমান!

একাত্তরের এই দৃশ্যগুলোর মর্মার্থ ভালো করে বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু নজর দিতে হবে পাকিস্তানিদের সে সময়কার মন মানসিকতার দিকে। পাকিস্তানি জেনারেলরা আর কিছু পারেন আর নাই পারেন উনারা এই দেশের মানুষের রক্তে দুই হাত রঞ্জিত করে নিজ দেশে গিয়ে অতঃপর হাতে কলম তুলে নিয়েছেন। সবাই বই লিখে নিজের সাফাই গাওয়া শুরু করেন। তাদের এসকল সাফাই গাথার মধ্যেও ফুটে উঠছিল তাদের মন মানসিকতার ধরন। গবেষক মুনতাসীর মামুন পাকি জেনারেলদের বইগুলো পর্যালোচনা করে *পাকিস্তানি জেনারেলদের মন* এবং পাকিস্তানি বিভিন্ন পেশার মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে *পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে একাত্তর* নামক দুটো গবেষণাধর্মী বই লিখেন। আমাদের এই পর্ব মূলত মুনতাসীর

মামুনের এই দুই বইয়ের ভিত্তি করেই লেখা।

পাকিস্তানিরা একাত্তরে পাকিস্তান ভাঙার যে সকল কারণ তাদের বইতে বলেছেন তা খুব সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করেছেন মুনতাসীর মামুন।

“ক) হিন্দু শিক্ষকরা বাঙালিদের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। ফলে হিন্দুত্বের ঝোঁক ছিল বেশী।
খ) ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে প্ররোচিত করেছে বিদ্রোহে এবং লড়াইটি ছিল ভারত ও পাকিস্তানের।
গ) ১৯৭১ এর যুদ্ধটা ছিল গৃহযুদ্ধ। আ'লীগ হলো ভারতের অনুগত একটি দল।
ঘ) পাকিস্তান ভাঙার জন্যে মূলত ভুট্টো মুজিব দায়ী, বিশেষ করে মুজিবের একঘেয়েমি”।

প্রথম কারণটার দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে পাকিস্তানিদের মনোজগতে আসলে কি কাজ করত। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, পাকিদের কাছে সমীকরণটা খুবই পরিষ্কার ছিল, পাকিস্তান = মুসলমান, ভারত = হিন্দু।

রাও ফরমান আলী ১৯৯২ সালে How Pakistan got divided নামক বইটা লিখেন। এই বইটাতে তিনি শুধু হিন্দুত্ব তত্ত্ব এনে হাজিরই করেন নি, বরং তাজউদ্দীনকে পর্যন্ত হিন্দুর ছেলে বানিয়ে দিয়েছেন। তার বই এর এক জায়গায় তাজউদ্দীন সম্পর্কে বলেন, “Tajuddin, the diehard Pro-Indian Awami leaguer, came in and sat down. He hated West Pakistan and perhaps Pakistan itself. He was reputed to have a Hindu up to the age of 8. I do not think this story was correct but it revealed his mental make-up”।

“তাজউদ্দীন, গোঁড়া ভারত পন্থী আওয়ামী লীগার, ভেতরে এলেন এবং বসলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে এবং সম্ভবত পাকিস্তানকেও ঘৃণা করতেন। তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত হিন্দু ছিলেন বলে একটা প্রচারণা ছিল। আমি গল্পটিকে সত্য মনে করি না। কিন্তু তাঁর মানসিক গঠনে এর যথেষ্ট প্রকাশ ঘটত”।

পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করত, তাজউদ্দীন আহমদ কোন মুসলমান নয়, তিনি একজন ভারতীয় হিন্দু, আসল নাম তেজারাম। পাকিস্তানকে ভাঙার জন্যেই তিনি পাকিস্তানে প্রবেশ করেছেন। এমনকি ১৯৭১ এ একজন পাকিস্তানি অফিসার তাজউদ্দীন আহমদের শশুরকে জিজ্ঞেস করেছিল, “সৈয়দ সাহেব, আপনি ছিলেন আরবি প্রফেসর এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও আপনার অগাধ জ্ঞান রয়েছে। অথচ আপনার মেয়ের কি না বিয়ে দিলেন এক হিন্দুর সঙ্গে”।

যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থাতেও পাকিস্তানিদের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নি। যুদ্ধের আটাশ বছর পরে মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানে গিয়ে সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছিলেন রাও ফরমানের। সেখানে এক প্রশ্নের জবাবে রাও বলেছিলেন, " আমরা এখনো পুরোপুরি বুঝি ও বিশ্বাস করি যে, হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানের মন মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে"।

ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লা খানের East Pakistan to Bangladesh' নামের এই বইটা প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। তার মতে, এ দিককার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে এবং তারাই পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা চালায়। তার বইয়ে তিনি একটা ঘটনার উল্লেখ করেন যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে তাঁর মন মানসিকতা। ঘটনাটা এরকম: "স্থানীয় হাই স্কুল পেরুবার সময় আমরা দেখলাম একটি শহীদ মিনার। ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকায় ২/৩ জন ছাত্র মারা যায়, ইতোমধ্যে সারা দেশের প্রতিটি স্কুলে শহীদ মিনার গজিয়ে উঠেছে। মিনারের পাদদেশে আছে একটি কবর। সকালে মিনার প্রদক্ষিণ একটা রিচুয়াল। খালি পায়ে, হাতে ফুল নিয়ে প্রভাত ফেরীতে অংশ নিতে হয়। হিন্দুয়ানি না হলেও হিন্দু সংস্কৃতি তো বটেই"।

খেয়াল করুন, একদিকে যেমন মিথ্যের ফুলঝুরি [কবর] আছে অন্যদিকে এখানেও আছে সেই হিন্দুত্বের সন্ধান পাওয়ার গল্প।

জেনারেল গুলাম উমর ১৯৭১ এ ইয়াহিয়ার বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটির সচিব ছিলেন। মুনতাসীর মামুনের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনিও ঐ একই ধরণের কথা বলেছিলেন, হিন্দুরা দেশ ভাগের সময় খুব একটা যায়নি এবং তারাই প্রভাবিত করেছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের।

এমন না যে, শুধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লোকদের মতামতই ছিল, বরং তাদের রাজনীতিবিদদের চিন্তাধারাও এমন ছিল। গফুর আহমদ, ১৯৭০ সালে তিনি জাতীয় পরিষদে নির্বাচিতও হয়েছিলেন। তার মতে, "আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে যাই তখন আমাকে বলা হয় যে, ওখানকার গোটা জনসমষ্টির একটা বড় অংশ পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতে চলে গেছে। তবে স্কুলের শিক্ষকরা যায় নি। ওরা এখনো রয়ে গেছে। আমাকে ঐ সময় আরও জানানো হয় যে, ঐসব হিন্দু শিক্ষক দেশের অখন্ডতার ধারণার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী ছেলেমেয়েদের মন বিষিয়ে তুলেছে। তারা এক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে কাজ করছে একেবারে গোঁড়া থেকেই। তাদের বিশ্বাস ছিল পাকিস্তান টিকবে না। এটা অল্পদিনের মধ্যেই খতম হয়ে যাবে আর দেশটি আবার ভারতের অঙ্গ হবে"।

একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন এই হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব চতুর্দিকে প্রচারিত করা

হলো? কেন-ই-বা পাকিস্তানি জেনারেলরা বারে বারে শুধু এই প্রসঙ্গটাই এনেছেন? এই প্রশ্নের সুন্দর একটা কারণ বর্ণনা করেছেন তাদেরই একজন, এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান। তিনি অবশ্য রাজনীতিতে খুবই সক্রিয় ছিলেন। তিনি বলেন,

"পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দু ছিল এ কথা সত্যি। তাই সেখানে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বাস করবে এও স্বাভাবিক। তবে আপনি এই যে প্রচারণার কথা বললেন, ওরা পূর্ব পাকিস্তানে যা করেছে তাঁর যৌক্তিকতা খাড়া করার জন্যই এটা করা হয়েছে। আমাদের এখানকার সমাজে হিন্দুর তেমন অস্তিত্ব নেই। কাজেই এ ধরনের প্রচারণা এখানে পাত্তা পেতে সক্ষম হয়। যে ব্যবস্থা ওখানে নেয়া হচ্ছিল তাকে যৌক্তিকতা দেবার জন্যই এ প্রচারণার অবতারণা"।

পাকিস্তানিদের মনে এই হিন্দু বিদ্বেষী ভাবটা এত গভীরে চলে গিয়েছিল যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক পরেও তারা এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে পারে নি। পূর্বেই রাও ফরমানের সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পাকিস্তানি আরেক জেনারেল কামাল মতিনউদ্দিন ১৯৯২ সালে একবার ঢাকায় এসেছিলেন, তখন শবেবরাতের রাত ছিল। তিনি দেখলেন টিভিতে শবেবরাতের ফজিলত বর্ণনা করা হচ্ছে এবং পরে আজানও প্রচার করা হচ্ছে। এতে বেশ অবাক হয়ে তিনি পরিচারককে জিজ্ঞেস করেন, প্রতিদিন কি নামাজের সময় এখানে আজান প্রচারিত হয়? সে পরিচারিকা তখন বেশ ক্ষুদ্ধ হয়েই উত্তর দিলেন, আভ আপকো মালুম হুয়া কী হামভী মুসলমান হ্যাঁয়, হামকো হিন্দু সমাজ কার মার দিয়া। এই ঘটনার কথা তিনি নিজেই তাঁর বইয়ে উল্লেখ করে লিখেছিলেন, "This remark coming spontaneously from a semi literate, lower middle class Bengali youth, twenty one years after the breakup, shook me"

২

পাকিদের উপরোক্ত কথা শুনে কিংবা লেখা পড়ে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক যে, পাকিস্তানি জেনারেলরা খুবই ইমানদার মানুষ ছিলেন। তারা সর্বদাই হিন্দুদের আগ্রাসন নিয়ে ভীত থাকতেন, ইসলাম বিপন্ন বলে কাঁদতেন, হিন্দু শিক্ষকদেরকে অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এবং এ কারণে বাংলার মুসলমানদের অধঃপতন দেখে তারা খুবই কষ্ট পেতেন। অবশ্য তাদের বইগুলো পড়লে আবার অন্য জিনিস চোখে পড়বে, তারা যখনই দু তিনজন মিলিত হচ্ছেন, একসাথে বসে মদ্যপান করছেন যদিও এটা ইসলামে পুরোপুরি হারাম। এবার একটু দেখি এই ইমানদার জেনারেলরা, যারা লেখার প্রতিটা লাইনে লাইনে ধর্মকে তুলে এনেছেন, ৭১ সালে এই বাংলায় আসলে তারা কি করেছিলেন? আসুন কয়টা কেস স্টাডি দেখি!

চার সৈনিক হামলা করেছে এক বাসায়। বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কন্যাটি অল্প বয়সী, সে হাতজোড় করে তাদের জানাল যে, সে মুসলমান, তাকে যেন তারা বোনের মত দেখে। তারপরও যখন তারা এগিয়ে আসছে তখন সে বলল, আমিওতো পাকিস্তানি। তোমাদের কারও হয়ত আমার মত মেয়ে আছে। তাও তারা মানছে না। তখন সে বিছানার পাশে কোরআন শরীফ রেখে বলল। আমার যদি কিছু করতে চাও তাহলে এই কোরআন ডিঙ্গিয়ে করতে হবে।
তারা কোরআন ডিঙ্গিয়ে ছিল..."

উক্ত ঘটনাটা যিনি বলেছেন তিনি একজন পাকিস্তানি, সৈয়দ আলাদার রাজা। ১৯৭১ এর মে মাসে ঢাকার কমিশনার পদ লাভ করেন। খেয়াল করে দেখুন, পবিত্র কোরআন শরীফ ও কিন্তু তাদেরকে রুখতে পারে নি।

One of the most horrible revelations concerns 563 young Bengali women, some of 18, who have been held captive inside Dacca's dingy military cantonment since the first five days of the fighting, Seized from University and Private Homes and forced into military brooch, the girls are all three to five months pregnant." - *নিউইয়র্ক টাইমস, ২৫ অক্টোবর ১৯৭১।*

"আগুনে পোড়া গ্রামকে পেছনে ফেলে দুই কিশোরী মেয়ে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্ছিলেন চন্দ্রমণ্ডল। কাদামাটির ভেতর দিয়ে। একটু পর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লেন। অসহায় চোখে তাকে দেখতে হলো তাঁর মেয়েদের ধর্ষণের দৃশ্য। বারবার, বারবার, বারবার"। - *নিউজউইক, ২ আগস্ট, ১৯৭১।*

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্রোহীদের খুঁজতে আসার ভান করে ডেমরা গ্রাম ঘেরাও করে। তারপর ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সী সকল নারীকে ধর্ষন করে এবং ১২ বছরের বেশি সকল পুরুষ কে হত্যা করে"। *-নিউজ উইক, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭১।*

"ঘরে ঢুকে দেখি, এ ই দৃশ্য! ও আল্লাহ, এমন দৃশ্য দেখার আগে কেন আমার দুটি চোখ অন্ধ করলো না আল্লাহ। মেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণ! কয়েকটি পাগলা কুত্তা আমার মাকে ও বড় বোনটিকে খাচ্ছে কামড়ে কামড়ে। ... রাত ভোর হয় হয় এমন সময় তারা চলে গেছে, মা ততক্ষণে মৃত। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল আমার অর্ধমৃত রক্তাক্ত বোনটিকে"। - *৭১ এ সবাইকে হারানো কিশোর শফিকুরের আর্তি।*

Rape in Bangladesh had hardly been restricted to beauty. Girls of eight and grandmothers of seventy five had been sexually assaulted Some women may have been raped as many as eighty times in a night.- *সুসান ব্রাউনমিলার*

"যুদ্ধশেষে ক্যাম্পের একটি কক্ষ থেকে কয়েকটি কাঁচের জার উদ্ধার করা হয়; যার মধ্যে ফরমালিনে সংরক্ষিত ছিলো মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অংশ। অংশগুলি কাটা হয়েছিলো খুব নিখুঁতভাবে"- *খুলনার ডা. বিকাশ চক্রবর্তী।*

"There were six soldiers in all. Two went into the room that had been built for the bridal couple.The others stayed behind with the family, one of them covering them with his gun. They heard a barked order, and the bridegroom's voice protesting. Then there was silence until the bride screamed. Then there was silence again, except for some muffled cries that soon subsided.

In a few minutes one of the soldiers came out, his uniform in disarray. He grinned to his companions. Another soldier took his place in the extra room. And so on, until all the six had raped the belle of the village. Then all six left, hurriedly. The father found his daughter lying on the string cot unconscious and bleeding. Her husband was crouched on the floor, kneeling over his vomit."

-Aubrey Menen, The Rapes of Bangladesh, New York Times, ২৩ জুলাই, ১৯৭২।

সারাদিন ধর্মের গান শোনানো পাকিস্তানিরা আসলে যা করেছিল তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১) ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল

২) চার-ছয় লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল

৩) ঢাকায় পুনর্বাসন কেন্দ্রের একজন ডাক্তার জানান যে, ১৯৭২ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার গর্ভবতী নারীকে এবরশন করানো হয় এবং ৩০ হাজার যুদ্ধ শিশু জন্ম গ্রহণ করে।

৪) এককোটি লোক চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল শরণার্থী শিবিরে।

এমনকি, সাতক্ষীরায় মসজিদের ভিতরেও বেশ কিছু নারী দেহ উদ্ধার করা হয়।

৩

উপরের ঘটনাগুলো আপনার কাছে খারাপ কাজ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা এবং শাসকেরা কিন্তু এটাকে মোটেও খারাপ কাজ বলে মনে করেন নি। তাদের এ কাজের পিছনে আবারো তারা হাজির করেন ধর্মকে, তাদের সেই "ইসলামী-পাকিস্তানি" আদর্শ তত্ত্বকে। তারা এ কাজটা করেছিলেন শুধুমাত্র হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত বাঙালিদেরকে মানুষ করার জন্যে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সাচ্চা মুসলমান ও সাচ্চা পাকিস্তানি বানানোর জন্যে।

অস্ট্রেলিয়ার এক মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট, ডা. জেফ্রি ডেভিস ১৯৭২ সালের মার্চ থেকে প্রায় ছয় মাস বাংলাদেশে কাজ করেছেন। বিনা ডি কস্তা যুদ্ধের ৩২ বছর পর তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। ডেভিসের সে সাক্ষাৎকারে ফুটে উঠেছিল সে সময়ের নারী নির্যাতনের যাবতীয় দিকগুলো; তিনি নারীদের এবরশন, যুদ্ধ শিশু, নারীদের তখনকার অবস্থা সবকিছু নিয়েই কথা বলেন। সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক দুটো লাইন তুলে দিলাম।

B: How did they justify raping the women?
GD: They had orders of a kind or instruction from Tikka Khan to the effect that a good Muslim will fight anybody except his father. So what they had to do was to impregnate as many Bengali women as they could. That was the theory behind it.

B: Why did they have to impregnate the women? Did they tell you?
GD: Yes, so there would be a whole generation of children in East Pakistan that would be born with the blood from the West. That's what they said.

তার মানে তাদের ওপর সরাসরি আদেশ ছিল বাংলার নারীদেরকে ধর্ষণ এবং গর্ভবতী করা যেন তারা সাচ্চা মুসলমান ও পাকিস্তানি বাচ্চা জন্ম দিতে পারে।

২৫ শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইট কার্যকর কারী মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা ২০১২ সালে "A stranger in my own country" নামে এক গ্রন্থে সে সময়ের দুটো ঘটনা উল্লেখ করেছেন: ১০ এপ্রিল এক সভায় জেনারেল নিয়াজি বাঙ্গালীদের নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, ম্যায় ইস হারামজাদি কওম কি নাসাল বদল দুন গা। ইয়ে মুঝে কীয়া সামঝতি হ্যায়'।

পরের দিন খাদিম ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগে যখন ব্রিফ করতে যান নিয়াজির কাছে তখন নিয়াজি বলেন, "দোস্ত, যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না.....এখন বরং তোমার বাঙালি বান্ধবীদের ফোন নাম্বার গুলি আমাকে দাও"। খাদিম নিজেই অবাক হয়ে লিখেন, For a person of my disposition, these remarks were a thunderbolt. I could not imagine that any same Pakistani could think in such terms in the midst of civil war inflicted on the nations by its recent rulers.

অবশ্য এ ব্যাপারে তার সম্মতি যে ছিল সেটা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। "You can not expect a man to live, fight and die in the east Pakistan and go to Jhelum for sex, would you?" (সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে থাকছে, লড়াই করছে এবং মারা যাচ্ছে আর সেক্সের জন্যে কি তারা

ঝিলাম যাবে?)

এক পাকিস্তানি মেজর তার বন্ধুকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছে।
"We must tame the Bengali tigress and change the next generation, Change to better Muslims and Pakistanis."

এ বিষয়ে বিখ্যাত ভারতীয় ঔপন্যাসিক মুলক রাজ আনন্দ ১৯৭২ সালে বলেন, "Rapes were so systematic and pervasive that they had to be conscious Army policy. Planned by west Pakistanis in a deliberate effort to create a new race or to dilute Bengali nationalism."

ধর্ষণের বিভিন্ন কেস স্টাডি গুলো বর্ণনা করে গবেষক মুনতাসীর মামুন বলেন, "ধর্ষণগুলির একটা প্যাটার্ন আছে। তবে যে বিষয়টা স্পষ্ট, তা হলো পাকিস্তানের দমন নীতির একটা হাতিয়ার ছিল ১) ধর্ষণ ২) ধর্ষণের মাধ্যমে নতুন জাতি সৃষ্টি ৩) কলোনির অধস্তন মানুষ হিসেবে যেনতেন ব্যবহার, যেন মানুষ নয়, সামগ্রী মাত্র ৪) জৈব আকাঙ্ক্ষা মেটানোর রাস্তা এবং এক রকম প্রতিশোধ স্পৃহা যা প্রথম ও দ্বিতীয়টির সম্পূরক"।

এমন না যে তারা শুধু ধর্ষণটাকেই জায়েজীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, বরং, আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে তারা বারবার হিন্দু মুসলিম যুদ্ধের প্রলেপ দেয়ার চেষ্টাও চালাচ্ছিলেন। যে কোন জনসভায় কিংবা বিদেশী নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের কাছে গণহত্যাটাকে জেহাদ বলে প্রচার করা হচ্ছিল। ডিসেম্বরের ১ তারিখে "দৈনিক পূর্বদেশ" এর খবরটা দেখুন, "জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, আমরা টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করছি কাজেই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে ভারত সম্প্রসারণের বাসনা পূরণের জন্যই যুদ্ধ করছে। ইতিহাসের দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, মুসলমানদের সংখ্যা সব সময়ই কম কিন্তু তবুও তারা কখনো পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করেনি। অতীতে আমরা হিন্দুদের বহুবার পরীক্ষা করেছি প্রত্যেকবার তারা পরাজিত হয়েছে। এবারও আমাদের জয় হবে ইনশাল্লাহ"।



মুসলমানরা কখনো পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করেনি ঃ নিয়াজী

সৈয়দপুর, ৩০শে নবেম্বর (এপিপি)।— ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজীর সভাপতিত্বে এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় জনগণ ভারতীয় হামলা নস্যাৎ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সাহায্য দানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

একজন পাকিস্তানী জীবিত থাকা ... জেহাদ,' 'ভারতকে ধ্বংস কর' ও 'হিন্দ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস কর' উল্লেখযোগ্য। উৎফুল্ল জনতা প্রায় সারাক্ষণ সভায় এ শ্লোগান দিতে থাকে।

ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল নিয়াজী জনগণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন দানের জন্য সৈয়দপুরের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, যে স্থানের জনগণের এত অদম্য উৎসাহ তারা কখনই পর্যুদস্ত হতে পারে না বলে তিনি নিশ্চিত। জনতার 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে জেনারেল নিয়াজী ঘোষণা করেন, ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের পক্ষে।

জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, আমরা টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করছি কাজেই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে ভারত সম্প্রসারণের বাসনা পূরণের জন্যই যুদ্ধ করছে।

আগস্ট মাসে নিয়াজী বগুড়া সফরে যান, সেখানে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা জাতির জন্য এক অমূল্য সেবা করছেন। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সেবা করার অর্থ হলো ইসলামের সেবা করা এবং আল্লাহ তাদের এ মহান কাজের জন্য অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন'। [*দৈনিক পাকিস্তান*] এই নিয়াজী কিন্তু প্রতিরাতেই বিভিন্ন নারীদের কাছে যেতেন এবং চরম অশ্লীল লোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাও ফরমানের বইয়ে তার এমন কাজকর্মের কথা উল্লেখ আছে।

দৈনিক পূর্বদেশ এর অন্য একটা সংবাদের শিরোনাম ছিল, "বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের প্রতি মালেকের আহ্বান"। সে আহ্বানে তারা কতটুকু সাড়া দিয়েছে আমরা সকলেই জানি। হিন্দুদেশের মদদে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশকে ভাঙার কারণে সৌদি আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি প্রথম চার বছরেও। এমনকি বাংলার মানুষকে দু বছর হজ্জ পালন করতেও দেয়া হয় নি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ বলে। সৌদি আরব আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরেই।



বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রতি মালেকের আহ্বান

করাচী, ৩০শে নভেম্বর (এপিপি)।—পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ এ. এম. মালেক মুসলিম ঐক্যকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে স্বার্থবাদী মহল যে খেলা খেলছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

এখানে সাংবাদিকদের সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে করাচীতে অনুষ্ঠিত ইসলামী দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সফল সম্মেলনের উল্লেখ করেন। গত ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালে ডাঃ মালেক উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে, উক্ত সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাবাবলীর মধ্যে একটি মুসলিম কমন মার্কেটের প্রস্তাব করা হয়।

তিনি বলেন যে, স্বার্থবাদী মহল এ প্রস্তাব সমর্থন করে নি।

তিনি বলেন যে, বিশ্ব মানচিত্রে পাকিস্তান সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ হওয়ায় বিশ্ব মুসলমানদের জন্য সর্বদা তার শক্তি নিয়োগ করে আসছে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো স্বার্থবাদী মহলের

তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ মালেক অক্টোবরের দিকে লাহোরের এক উর্দূ মাসিক পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তার সে সাক্ষাৎকারে তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলেই আখ্যায়িত করেছিলেন। সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নিম্নরূপঃ

> *প্রশ্ন: বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী বলে আপনি মনে করেন কি?*
>
> *উত্তর: যেভাবে তাঁর অভ্যুদয় দেখেছি তাতে তা নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানি আদর্শে পরিপন্থী।*
>
> *প্রশ্ন: সামরিক বাহিনীর তৎপরতার পর সারা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সফর করে আমার এরূপ ধারণা হয়েছে যে আওয়ামীলীগ পাকিস্তান থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। এরূপ মনোভাবের অধিকারী*

লোকের সাথে এখন কি একত্রে কাজ করা সম্ভব?
উত্তর: ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার মনোভাব নিয়ে এবং যারা ইসলামে বিশ্বাসী তারা যদি ইসলামের শিক্ষাকে কাজে প্রয়োগ করেন, মহানবী (স) ও তাঁর সাহাবারা যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এক সাথে থাকতে পারি।

মে মাসে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে ইয়াহিয়া খান বেতারে দেয়া এক বাণীতে বলেন, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে অবিনশ্বর। পাকিস্তান আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এবং আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তার বাণী শুনে এক পত্রিকা মন্তব্য করে, তাঁর এই আবেদনের মধ্যে ইসলাম বিপন্ন সুর ফুটে উঠেছে।

"দৈনিক পূর্বদেশ" ১১ ডিসেম্বর *তথ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণ: সমগ্র জাতি জেহাদের জন্য প্রস্তুত* শিরোনামের খবরে বলে, "...আল্লাহর নাম উৎসর্গীকৃত জনতার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে ভারত কোনদিন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন যে, জেহাদের আদর্শে উদ্দীপ্ত মুসলমান জাতি সবসময়ই শত্রুকে পর্যদুস্ত ও নস্যাৎ করে দিয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে তিনি আশা করেন"।

তথ্যমন্ত্রী ভাষণের দুটো জিনিস খেয়াল করেন, তাহলে বুঝ নেয়া যাবে ধর্মটাকে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক, সেনাবাহিনী তাহলে "আল্লাহর নাম উৎসর্গীকৃত জনতার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি সশস্ত্র বাহিনী" ছিল যারা একাধারে যেমন মানুষ মেরেছে তেমনি নারীও ধর্ষণও করেছে। এই কর্মকান্ড কিভাবে ইসলামের মধ্যে পড়ে? দুই, "জেহাদের আদর্শে উদ্দীপ্ত মুসলমান" এটা কেন জেহাদ তা কি বোঝা যাচ্ছে? যেহেতু আগেই আলোচনা করেছি পাকিস্তানিদের ধারণা ছিল এই দিকের সবাই হিন্দু হয়ে গিয়েছে, নাহলে হিন্দু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গিয়েছে, মানে কাফের হয়ে গিয়েছে, অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা জেহাদই বটে।



তথ্য মন্ত্রীর বেতার ভাষণ

সমগ্র জাতি জেহাদের জন্য প্রস্তুত

ঢাকা, ১০ই ডিসেম্বর (এপিপি)।—পূর্ব পাকিস্তান তথ্য মন্ত্রী জনাব মুজিবর রহমান গতকাল বলেন যে, জাতিসংঘের সনদ লংঘন করে ভারত দেশের উত্তর অংশে যে হামলা শুরু করেছে তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য সমগ্র জাতি জেহাদের জন্য প্রস্তুত।

বেতারে ভাষণদানকালে তথ্যমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের ভাষণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ভারতের চালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পাকিস্তানের বার কোটি জনগণ দেশের অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে রয়েছে।

পরিপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভারতকে সচেতন করে দিয়ে তিনি বলেন যে, আল্লাহর নাম উৎসর্গীকৃত জনতার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে ভারত কোনদিন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন যে, জেহাদের আদর্শে উদ্দীপ্ত মুসলমান জাতি সবসময়ই শত্রুকে পর্যদুস্ত ও নস্যাৎ করে দিয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে তিনি আশা করেন।

যতই দাবি করুক এক দেশ, আসলে তখনকার অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক বৈষম্যতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানিরা শুরু থেকেই বাঙালিদের কলোনি করেই রাখতে চাচ্ছিল এবং এর প্রয়োজনেই দরকার ছিল এক মোক্ষম অস্ত্রের। ইসলাম ও ধর্ম কে তারা বানিয়ে ফেলে সেই মহামারী অস্ত্র যার প্রকোপ চলছিল পুরো পাকিস্তান আমল জুড়েই। পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে বাঙালি ছিল সর্বদা নিচু জাত, কমজোর মুসলমান এবং হিন্দু দ্বারা প্রভাবিত সংকর মুসলমান। এই থিওরি তারা প্রচার করে বেড়িয়েছে সর্বদা। বহুদিনের পরিকল্পনায় সংঘটিত অপারেশন সার্চলাইট এর পরবর্তী কার্যকলাপ তাদের সে ধ্যান ধারণারই ফসল। মানুষ হত্যা করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে, আবার এর জায়েজীকরণের জন্যে আশ্রয় খুঁজেছে ধর্মের তলে। মানুষের মধ্যে তারা ছড়িয়েছে ধর্মীয় বিষবাস্প যাদের দেখানো পথে এখনো বাংলাদেশ জুড়ে চলছে এমনই বিষের হাওয়া।

তথ্যসূত্রঃ

১) পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে একাত্তর - মুনতাসীর মামুন

২) The Rape of Bangladesh- অ্যান্থনী মাসকারেনহাস

৩) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র

৪) অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সামরিকজান্তা ও তার দোসরদের অপতৎপরতা
 - সুকুমার বিশ্বাস

৫) মুক্তিযুদ্ধ ও তারপরঃ একটি নির্দলীয় ইতিহাস - গোলাম মুরশিদ

৬) মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ - মুনতাসীর মামুন

৭) গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ - মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমদ

৮) 8 stages of genocide - Dr. Gregory H. Stanton

৯) ঘাতকের দিনলিপি - রমেন বিশ্বাস

It's not only utterly shocking but we are ashamed that we belong to human race which is capable of doing this.

প্রারম্ভঃ

প্রথমেই বলি, "দালাল" বলতে আমি ১৯৭২ সালের দালাল অধ্যাদেশ এর দালালের সংজ্ঞাটাই বুঝি,

> *"১) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে বেআইনি দখল টিকিয়ে রাখার জন্য সাহায্য করা, সহযোগিতা বা সমর্থন করা।*
> *২) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখলদার পাক বাহিনীকে বস্তুগত সহযোগিতা প্রদান বা কোন কথা, চুক্তি ও কার্যাবলীর মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করা।*
> *৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের চেষ্টা করা।*
> *৪) মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।*
> *৫) পাক বাহিনীর অনুকূলে কোন বিবৃতি প্রদান বা প্রচারণায় অংশ নেয়া এবং পাক বাহিনীর কোন প্রতিনিধি, দল বা কমিটির সদস্য হওয়া। হানাদারদের আয়োজিত উপনির্বাচনে অংশ নেয়া"।*

সংজ্ঞানুযায়ীই সাধারণত শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল শামস এর নেতাকর্মীদেরকেই দালাল বলা হয়ে থাকে। একাত্তরের পুরো সময়টাতে এই দালালদের কর্মকাণ্ড খেয়াল করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে তারা ধর্মের ব্যবহার করেছে মূলত নিম্নোক্ত উপায়েঃ

১) পাকিস্তান ও ইসলামকে এক ও অভিন্ন হিসেবে উপস্থাপন করা
২) পাকিস্তান কে আল্লাহর ঘর বলা
৩) যুদ্ধটাকে হিন্দু মুসলিম আখ্যায়িত করে জেহাদের ডাক দেয়া
৪) স্বাধীনতাকামী বাঙালিদেরকে কাফের, মুনাফেক বলে আখ্যায়িত করা এবং
৫) যেহেতু জেহাদ, তাই নারীরা গনিমতের মাল বলে ধর্ষণকে জায়েজ করা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই ইসলামিক আদর্শকে সামনে রেখে, মানে ধর্মকে ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি ইসলামিক দল গড়ে উঠে। ৭১ এ হামলার পরপরই এই দলগুলো বিভিন্ন নামে তখন যোগ দেয় পাকিদের সাথে। মুনতাসীর মামুনের *আলবদর গ্রন্থ* থেকে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে সেটা তারা, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। মার্চের দিকেই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, পাকিস্তানের এই অংশকে হেফাজত করবে যেভাবে মসজিদ হেফাজত করা হয়। এই দলগুলোকে নিয়ে সর্বপ্রথম এপ্রিলের ৯ তারিখ দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ১৪০

সদস্যবিশিষ্ট ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয়। তবে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিলের পত্র পত্রিকায়। দৈনিক পাকিস্তানে *ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন* শিরোনামের খবরে বলা হয়, "নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রত স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত শুক্রবার ঢাকায় খাজা খায়ের উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ... এই সভা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্থানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে...।"

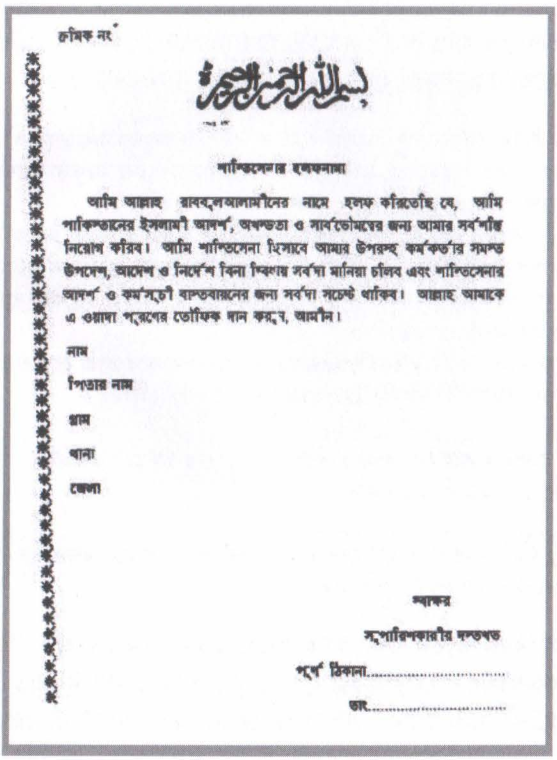

রোববারের দৈনিক পাকিস্তান
Sunday, April 11, 1971
ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি
জেনারেল টিক্কা খানের
ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন থেকে—

এই ছিল শুরু! একথা কারো অজানা নয় যে, এই শান্তি কমিটির আড়ালে লুকিয়ে ছিল জামায়াতে ইসলামী নামক দলটি। এই শান্তি কমিটি থেকে ধীরে ধীরে রাজাকার, আলবদর, আল শামস প্রভৃতি সশস্ত্র দল গঠিত হয়। এই দালালদের সাহায্য ব্যতিরেক পাকিরা এত বড় গণহত্যা এত কম সময়ে চালাতে পারত না। তাদের কর্মকাণ্ডে পাকিস্তানিরা এতই খুশি ছিল যে জেনারেল নিয়াজী তার বইটি রাজাকারদেরকেই উৎসর্গ করেন। রাজাকাররা পুরো নয় মাস জুড়েই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে, পাকিদের নারী সরবাহ করেছে । আর অন্যদিকে আলবদর ছিল ডেথ স্কোয়াড এবং তাদের লক্ষ্যও ছিল স্থির। প্রকৃতিতে তারা ছিল অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর (মুনতাসীর মামুন, "রাজাকারের মন")।

মুনতাসীর মামুন *রাজাকারের মন* বইটা লিখেছিলেন কয়েকজন দালালের লেখা বই ভিত্তি করে। এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, পাকিস্তানি দালালদের মন মানসিকতার সহিত গত পর্বে আলোচিত পাকিস্তানি জেনারেলদের এক বিশাল মিল লক্ষ্য করা যায়। তারাও দাবি করে যে, হিন্দুরাই ছিল সবকিছুর মূলে। এই হিন্দু তত্ত্বের আড়ালে আসলে তারা যা করেছিল তা হচ্ছে অবাধে নারী ধর্ষণ এবং নির্বিচারে বাঙালি নিধন। আখতার উদ্দিন আহমদ মালেক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭১-৭৩ সাল পর্যন্ত জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি Nationalism

and Islam: Indo–Pakistan Episode নামে একটা বই লিখেছিলেন। তার মতে জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম এ দুটির মধ্যে যে কোন একটি নিতে হবে। এই জাতীয়তাবাদের জন্ম যেহেতু বাংলাদেশে তাই এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ জন্যেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন ইসলামকে, এবং সাহায্য করেছিলেন পাকিস্তানিদের।

ইসলামকে কিভাবে ব্যাবহার করা হয়েছে তার একটা ছোট নমুনা দেয়া যাক। নিচের ছবিটা খেয়াল করেন, *শান্তি সেনা* নামক একটা দলের হলফ-নামা এবং উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর তালিকা দেয়া আছে। তাদের হলফনামায় লেখা আছে, 'আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে হলফ করিতেছি যে, আমি পাকিস্তানের ইসলামী আদর্শ, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিব। আমি শান্তি সেনা হিসাবে আমার উপরস্থ কর্মকর্তার সমস্ত উপদেশ, আদেশ নির্দেশ বিনা দ্বিধায় মানিয়া চলিব এবং শান্তি সেনার আদর্শ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। আল্লাহ আমাদের এ ওয়াদা পূরণের তৌফিক দান করুন, আমিন'। তাদের যে ১৫ টি উদ্দেশ্য ও কার্যবলী ছিল তার প্রথমটাই হচ্ছে–'জনগনকে ইসলামী আদর্শ ও জাতীয় সংহতিতে উদ্বুদ্ধ করা'।



ক্রমিক নং

بسم الله الرحمن الرحيم

শান্তিসেনার হলফনামা

আমি আল্লাহ রাব্বুলআলামীনের নামে হলফ করিতেছি যে, আমি পাকিস্তানের ইসলামী আদর্শ, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিব। আমি শান্তিসেনা হিসাবে আমার উপরস্থ কর্মকর্তার সমস্ত উপদেশ, আদেশ ও নির্দেশ বিনা দ্বিধায় সর্বদা মানিয়া চলিব এবং শান্তিসেনার আদর্শ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। আল্লাহ আমাকে এ ওয়াদা পূরণের তৌফিক দান করুন, আমীন।

নাম

পিতার নাম

গ্রাম

থানা

জেলা

স্বাক্ষর

সুপারিশকারীর দস্তখত

পূর্ণ ঠিকানা..............................

তাং..............................

এই ধরণের দলগুলোর প্রতিটির লিফলেটে সবসময়ই লেখা থাকত, ‘আল্লাহু আকবর’ কিংবা ‘নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ ধরণের শ্লোগান, এটাও বেশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করা হয়েছিল। শান্তি কমিটি, রাজাকার কিংবা আলবদরের প্রতিটি মিছিলে যে সকল স্লোগান দেয়া হত কিংবা ব্যানার ফেস্টুনে যা লেখা থাকত সেগুলো নিম্নরূপঃ

‘পাকিস্তানের উৎস কি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’
‘পাকিস্তানি ফৌজ জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, ইন্দিরা গান্ধী মুর্দাবাদ...’
‘মুসলিম জাহান এক হও, ভারতকে খতম কর’
‘ভারতকে ধ্বংস কর, পাকিস্তানকে রক্ষা কর’
‘দুনিয়ার মুসলিম এক হও’
‘ভারতীয় দালালদের খতম কর’
‘হাতে লও মেশিনগান দখলকর হিন্দুস্থান’
‘হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে এক হও ’
‘ইসলামী সমাজ কায়েম কর’
‘আমার নেতা তোমার নেতা, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা’ ইত্যাদি ইত্যাদি

ঢাকার মোহাম্মদপুরে শান্তি কমিটির একটা শাখা সংগঠন ছিল, যারা ০৯/০৮/১৯৭১ তারিখের সভাতে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার মধ্যে কয়েকটা হলোঃ

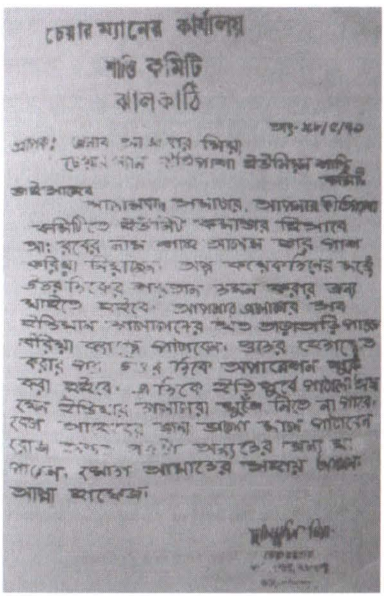
> *“১) উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং বিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক বিষয় করা হোক। বাংলা সাইনবোর্ড, নম্বর প্লেট ও নাম অপসারণ এবং সংস্কৃত ধরণের বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান হরফ ব্যবহার করতে হবে।*
> *২) যে কাফের কবি নজরুল ইসলামের ছেলেদের হিন্দু/বাংলা নাম রয়েছে তাঁর রচনাসহ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিই হিন্দু প্রভাবিত অংশ সমূহ বর্জন করতে হবে।*
> *৩) পূর্ব পাকিস্তানের রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় করতে হবে উর্দু অনুষ্ঠানের জন্য।*
> *৪) আমাদের পবিত্র ভূমিতে পাকিস্তান বিরোধীদের আসতে দেয়া হবে না। (যেমন, ইহুদিবাদী দুশ্চরিত্র ইসলামের শত্রু এডওয়ার্ড কেনেডি)*
> ....
> *৭) রাজাকার বাহিনীর বেতন ও শান্তি কমিটির ব্যয় নির্বাহের জন্য হিন্দু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।*
> ....
> *১০) বীর পাকিস্তানি ও আমাদের সত্যিকারের বন্ধুরাষ্ট্র চীনের সৈনিকদের নামে শহরগুলোর নামকরণ করতে হবে।”*

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭১ এর ১৫ জুন ঢাকা শহরের ২৪০টি শহরের রাস্তার নামকরণ করা হয়। যেমন, শাখারি বাজার রোডঃ টিক্কা খান রোড, মাদারটেকঃ মাজারটেক, এলিফেন্ট রোডঃ আল আরাবিয়া রোড, বেইলি

রোডঃ বুআলী রোড, রায়ের বাজারঃ সুলতানগঞ্জ। নামের মধ্যে মুসলমানি চেহারা আনার প্রচেষ্টা!

মে মাসের ২৮ তারিখ বরিশালের ঝালকাঠি শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান চিঠি দিয়েছিল কীর্তিশালা শান্তি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে।

"ভাই সাহেব
সালাম বাদ সমাচার, আপনার কীর্তিশালা কমিটিতে ইউনিট কমান্ডার হিসেবে আঃ রবের নাম শাহ আলম ছার পাশ করিয়া নিয়েছেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উত্তর দিকের শয়তান দমন করার জন্য যাইতে হইবে। আপনার এলাকার সব ইন্ডিয়ান দালালদের যত তাড়াতাড়ি পারেন ধরিয়া ক্যাম্পে পাঠাবেন। ওদের হেদায়েত করার পর উত্তর দিকের অপারেশন শুরু করা হইবে। এদিকে ইতিপূর্বে পাঠানো অস্ত্র যেন ইন্ডিয়ার দালালরা খুঁজে নিতে না পারে। বেগ সাহেবের জন্য ভালো মাল পাঠাবেন। রোজ অন্তত একটা অন্যদের জন্য মাল পাবেন। খোদা আমাদের সহায় আছেন। আল্লাহ হাফেজ।"


চেয়ারম্যানের কার্যালয়
শান্তি কমিটি
ঝালকাঠি

এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে 'মাল' মানে নারীর কথাই বলা হচ্ছে। শয়তান দমন মানে বাঙালি নিধনের কথাই বোঝানো হচ্ছে। খেয়াল করেন, তারা এই কাজগুলো করছিল এবং তার পাশাপাশি এটাও আশা রাখত যে, খোদা তাদের সহায় হবেন।

রাজাকার বাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল ৯৬ জন জামায়াতে ইসলামীর কর্মী নিয়ে।

একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় গ্রন্থ অনুযায়ী, বিভিন্ন পেশার মানুষদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হলেও মূলত তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। "প্রথমত, যারা পাকিস্তান ও ইসলামকে রক্ষার জন্যে বাঙালি হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য বলে মনে করেছিল। দ্বিতীয়ত, যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তৃতীয়ত, গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়"। এই প্রথম দলটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, এবং এরাই ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এমনকি বর্তমান বাংলাদেশ তাদের মতাদর্শী লোকে ভরপুর।

রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকেরা ব্যাপক সওয়াবের আশায় ধর্মান্তরকরণের কাজটা করত খুবই উৎসাহের সহিত। বাগেরহাটের প্রায় সাত আটশ' হিন্দু লোককে জোর করে ধর্মান্তরিত করে শান্তি কমিটির সদস্যরা। এরপর এই নওমুসলিমের মধ্যে অবিবাহিত ও বিবাহযোগ্য মেয়েদেরকে শান্তি কমিটির ইচ্ছানুযায়ী তাদের অনুগত যুবকদের হাতে তুলে দেয়া হয়। এমন হাজারো ঘটনা ঘটেছে পুরো বাংলা জুড়ে। সেই সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কোরআন শরিফ নিয়ে হাজির হওয়া এবং সেটা ছুঁয়ে শপথ করা ছিল তাদের একধরনের নিয়মিত কাজ। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে তাদের সামনে নিজেদেরকে ধার্মিক বলে প্রতীয়মান করার জন্যেই এই অপচেষ্টা। কেননা, ধার্মিকতার আড়ালে একদিকে যেমন ঢেকে রাখা যাবে খারাপ কাজগুলোকে, তেমনি প্রকাশিত খারাপ কাজকে বৈধতাও দেয়া যাবে। ৮ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামের তৃতীয় পৃষ্ঠায় একটা ছবি ছাপা হয়, যার ক্যাপশন ছিলঃ রাজাকার বাহিনীর প্রথম দলটি কোরআন শরীফ নিয়ে শপথ গ্রহণ করছেন।

আলবদর তৈরি হয় তারও অনেক পরে। আবু সাইয়িদ *সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম* গ্রন্থে জানান, " আগস্ট মাস হতেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্র-সঙ্ঘকে আল বদরে রূপান্তরিত করা হয়। ... তাদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে বুদ্ধিজীবী হত্যায় পাঠানো হয়"। এই দলটার নামকরণের মধ্যেই বদর যুদ্ধকে টেনে এনে ধর্মের ব্যবহার শুরু করা হয়। এর প্রমাণও পাওয়া যায় *দৈনিক সংগ্রাম* এ প্রকাশিত নিজামীর লেখা এক প্রবন্ধে, "বদর যুদ্ধ থেকে অনেক কিছুই আমাদের শিখবার আছে। এই যুদ্ধের সৈনিকরা কেউ পেশাদার বা বেতুনভূক সৈনিক ছিলেন না। মুসলমানরা সবাই ছিলেন সৈনিক, তারা সবাই ছিলেন স্বতঃস্ফুর্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ...... পাক সেনার সহযোগিতায় এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। [*১৪ নভেম্বর, ১৯৭১*]

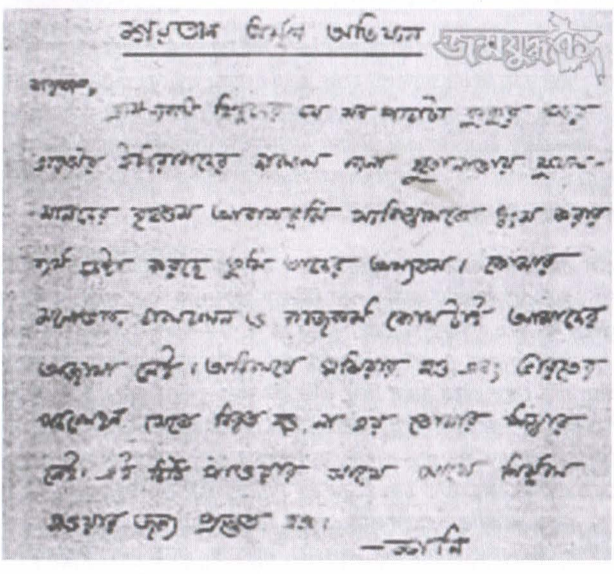
আলবদরের ট্রেনিং নাকি দু ধরনের ছিল সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক। মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের মধ্যে কোরআন, হাদিস নিয়ে আলোচনা করা হত এবং একদিন শুধু

জেহাদ এবং পরকাল নিয়ে জ্ঞান দেয়া হত। তাদের এই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ কেমন ছিল তা এক বিদেশী সাংবাদিকের মুখ থেকেই শোনা যাক। ৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরের রায়েরবাজার বধ্যভূমি দেখার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন, It's not only utterly shocking but we are ashamed that we belong to human race which is capable of doing this'.

আলবদর বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যার কিছুদিন আগ থেকেই ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের কাছে হুশিয়ারিমূলক বিভিন্ন চিঠি পাঠাতে শুরু করে। চিঠিটা *একাত্তরের ঘাতক ও দালাল কে কোথায়* গ্রন্থে দেয়া আছে -

শয়তান নির্মূল অভিযান

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের যে সব পা চাটা কুকুর আর ভারতীয় ইন্দিরাবাদের দালাল নানা ছুতানাতায় মুসলমানদের বৃহত্তর আবাসভূমি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তুমি তাদের অন্যতম। তোমার মনোভাব, চালচলন ও কাজকর্ম কোনটাই আমাদের অজানা নেই। অবিলম্বে হুঁশিয়ার হও, এবং ভারতের পদলেহন থেকে বিরত হও, না হয় তোমার নিস্তার নেই। এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। - শনি



শয়তান নির্মূল অভিযান

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের যে সব পা চাটা কুকুর আর ভারতীয় ইন্দিরাবাদের দালাল নানা ছুতানাতায় মুসলমানদের বৃহত্তর আবাসভূমি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তুমি তাদের অন্যতম। তোমার মনোভাব, চালচলন ও কাজকর্ম কোনটাই আমাদের অজানা নেই। অবিলম্বে হুঁশিয়ার হও এবং ভারতের পদলেহন থেকে বিরত হও, না হয় তোমার নিস্তার নেই। এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

—শনি

[কৃতজ্ঞতা: জন্মযুদ্ধ]

হুঁশিয়ার বার্তাটা পড়ে দেখেন, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পেছনের কারণ হিসেবে আবারো ধর্মকেই দাড় করানো হচ্ছে, হিন্দুদের দালাল বলা হচ্ছে।

২

এবার দেখব কয়েকজন প্রখ্যাত দালালের কাহিনী, পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিবৃতি থেকে যাদের কর্মকাণ্ডের একটা সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে।

একজন পীরের গল্প

তিনি একজন বিখ্যাত পীর এবং ধর্মকে সবচেয়ে বেশী কচুকাটা বোধহয় তিনিই করেছেন। একাত্তরের পুরো নয় মাস জুড়েই তার মুরিদ এবং তার দাওয়াতে আগত পাকিস্তানিরা বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তিনি হিন্দু নারীদেরকে গনিমতের মাল আখ্যায়িত করেছিলেন, এবং মুতা বিবাহ এর ফতোয়া দিয়েছিলেন। এই লোকটি হচ্ছেন বিখ্যাত (!) শর্ষিনার পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ। তার বাড়ি ছিল আইয়ুব আমল থেকেই গণবিরোধী চক্রের আখড়া এবং একাত্তরে সেটা হয়ে ওঠে পাকিস্তানিদের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। তার মুরিদরা কি করেছিলেন সেখানে সেটা *স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ৮ম খণ্ড*তে দেয়া আছে।

"ভারতী রাণী বসু
গ্রাম –স্বরূপকাঠি
জেলা –বরিশাল
২৭শে এপ্রিল আমি কাঠালিয়া থানার মহিষকান্দি গ্রামে যাই আত্মরক্ষার জন্য। তখন চারদিকে সব বিচ্ছিন্ন অবস্থা। হিন্দু বাড়ি বিভিন্ন স্থানে লুট হচ্ছে, হত্যা চলছে। ওখানে পৌঁছানোর পরপরই স্থানীয় কিছু লোক হিন্দু বাড়ি লুট শুরু করে দেয়। ২০/২৫ জনের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সকালে, দুপুরে, রাতে, ভোরে যখন তখন বল্লম, দা এবং অন্যান্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে হিন্দু বাড়ি আক্রমণ করে সব লুট করে ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। আমি স্বরূপকাঠিতে ফিরে আসি ৫ই মে। সেদিন ছিলো হাটবার। ঐ দিনই সমস্ত এলাকা লুট করে নেয় দুষ্কৃতিকারীরা।

৬ই মে সকালে পাক সেনা প্রথম স্বরূপকাঠিতে যায়। ওখানকার পীর শর্ষিনার বাড়ীতে গিয়ে পাক বাহিনী ওঠে। ওখান থেকে থানায় আসার পথে শর্ষিনার পুল থেকে থানা পর্যন্ত (সাহাপারা) সমগ্র হিন্দু বাড়ি প্রথমে লুট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওখান থেকে পাক বাহিনীর একটা দল অলঘারকাঠির দিকে গিয়ে ঘর বাড়ি জ্বালানো ও সেই সাথে মানুষ হত্যাও শুরু করে। আর একটা দল স্বরূপকাঠি এসে শুধু হিন্দু বাড়ি বেছে বেছে সকল হিন্দু বাড়ি লুট করে পুড়িয়ে দেয়। কালী প্রতিমার উপর অসংখ্য গুলি চালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বহুজনকে হত্যা করে। তারপর পাক বাহিনী ফিরে যায়। তারপর থেকে ক্রমাগত সাত দিন পাক বাহিনী স্বরূপকাঠিতে যায়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে আর লুট করেছে। স্থানীয় কিছু লোক এবং পীরের দল পাক বাহিনীর সাথে থাকতো। লুট করতে বলে তারা যখন লুট করতে আরম্ভ করে তখন পাক সেনারা ছবি তুলতো।
কুড়িয়ানা আটঘর, জলাবাড়ি, সমুদয়কাঠি, জুলুহারা, নান্দিঘর, সোহাগদল, ইন্দ্রিরহাট, মণিনাল, বাটনাতলা ইত্যাদি গ্রামসহ ৯টি ইউনিয়নে পাক বাহিনীরা গ্রামের প্রতিটি কোনাতে ঘুরে সব ধ্বংস করেছে, লুট করেছে।

কুড়িয়ানা আটঘরে পিয়ারার বাগানে বহুজন আশ্রয় নিয়েছিল। পাক বাহিনী হঠাৎ করে ঘিরে ফেলে অসংখ্য লোককে হত্যা করে। এক মেয়েকে পিয়ারা বাগান থেকে ধরে এনে সবাই মিলে পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারপর তিনদিন যাবৎ ব্লেড দিয়ে শরীর কেটে কেটে লবণ দিয়েছে। অশেষ যন্ত্রণা

লাঞ্ছনা দেওয়ার পর মেয়েটিকে গুলি করে হত্যা করে। মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ ছিল। অন্য একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এখানে অধিকাংশ লোককে গুলি করে এবং বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করেছে। শত শত লোককে এই এলাকাতে হত্যা করেছে।

কাউখালি স্টেশনে আমি নিজে দেখেছি একজনকে মুক্তিবাহিনী সন্দেহে রাজাকাররা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। স্বরূপকাঠিতে টিকতে না পেরে মহিষকান্দিতে যাই। ওখানে গেলে আমাকে সবাই মুক্তিবাহিনীর চর মনে করলো এবং অস্ত্র আছে বললো। আমি ওখান থেকে রাতে পালিয়ে যাই রাজাপুরে।

রাজাপুর থানাতে হামিদ জমাদার সমগ্র থানাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত বাড়িঘর লুট করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে, হত্যা করেছে। হিন্দু কোন বাড়িঘর ছিল না। সব ধ্বংস করেছিল। ওখানে শুক্কুর মৃধা শান্তি কমিটির সেক্রেটারি ছিল। আমি সহ আরো তিনজন তিন হাজার টাকা দিয়ে কোন রকম সেবারের মতো বাঁচি। আমি তখন কুমারী ছিলাম। সবাইকে মুসলমান হতে হবে এবং মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করতে হবে। এমনি একটি পরিস্থিতিতে সুনীল কুমার দাস নামে এক ভদ্রলোককে আমি বিয়ে করি সে সময় দুষ্কৃতিকারীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সময়টা ছিল জুন মাসের শেষ অথবা জুলাই প্রথম।

রাজাপুরে আছি স্বামীসহ। ভোরবেলা রাজাকার, পুলিশ মিলে প্রায় ৩০/৪০ জন আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। স্বামীকে লুকিয়ে রাখি। ওরা এসে সব কিছু লুট করে গালাগালি করে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে আবার এসে আর যা ছিলো সব নিয়ে অত্যাচার চালায়। পাশের একটি লোককে হত্যা করলো। নৈকাঠি রাজাপুর থানা গ্রামে শতকরা ৯৮ জনকে হত্যা করে। ওখানকার সব হিন্দু। ৯৮% মহিলা আজ বিধবা। নৈকাঠির প্রায় সব পুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করে হামিদ জমাদার ও তার দল। ঐ বিপদের মাঝে জঙ্গলে জঙ্গলে এ বাড়ি ও বাড়ি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার সব কিছু লুটে নেয় রাজাকার আর পাক বাহিনী। আমি কোন মতে পালিয়ে বাহিরচরে যাই জুলাই মাসের ১৭ তারিখে। আমি আমার কাজে যোগ দেই। তার পরপরই আমাকে সাসপেন্ড করে রাখে তিন মাস । বাহিরচরে সমগ্র এলাকা খুন, ডাকাতিতে ভরা। সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো।

অক্টোবর মাসে কুদ্দুস মোল্লাকে (মুক্তিবাহিনী) চিকিৎসা করার জন্য কর্নেল আমাদের সবাইকে ডেকে লাঞ্ছনা দেয়। যাবার পথে গানবোট থেকে আমাদের হাসপাতালে শেল ফেলে। আমরা দারোয়ান পাহারা রেখে মুক্তিবাহিনীর চিকিৎসা করেছি। আমাদের ডা. শামসুল হক মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গোপনে গিয়েও তাদের চিকিৎসা করেছেন। আমরা সবাই সবকিছু দিয়ে তাদের সাহায্য করতাম। বাহিরচরে পাক বাহিনীরা মেয়েদের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। বোয়ালিয়া, কাঁদপাশা, রাজগুরু, বাবুগঞ্জ থানা, দুয়ারিকা ইত্যাদি এলাকা থেকে বহু মেয়ে ধরে এনে ভোগ করেছে। আমার জানা এক হিন্দু মহিলাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়। মহিলা খুব সুন্দরী ছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চারদিন ক্রমাগত অকথ্য দৈহিক নির্যাতন চালায়। অসহ্য যন্ত্রণায় মহিলা ছটফট করেছে। চারদিন পর মহিলা ছাড়া পায়। আমরা তার চিকিৎসা করে ভালো করি।

আমি স্বামীসহ বাস করছিলাম। আমার সর্বস্ব যাওয়া সত্ত্বেও স্বামী নিয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার স্বামী স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। আমাকে প্রায় বলতেন ডিসেম্বর মাস যদি বাঁচি জানুয়ারির মধ্যে নিশ্চয় স্বাধীনতা পেয়ে যাবো।
৯ ই ডিসেম্বর গৌরনদী থানার মাহিলারার ব্রিজের উপর দিয়ে আমার স্বামী যাচ্ছিলেন। তখন পাক বাহিনী প্রায় আত্মসমর্পণ করে এমন অবস্থায় ব্রিজে ডিনামাইট স্থাপন করে রেখেছিলো। সেই

ডিনামাইট ফেটে ব্রিজ ধ্বংস হয়। আমার স্বামী ওখানেই নিহত হন। সব হারিয়ে একমাত্র স্বামী ছিলো তাও স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে হারাতে হলো।

আমি বাহিরচর থেকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জন্য খাবার পাঠিয়েছি। রাতে যখন তখন আমার ওখানে তারা এসে থাকতো, যেতো। আমার স্বামী মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে মাঝে মাঝে যেতেন। আমার স্বামীর বড় সাধ ছিলো স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাস করা। তার সে সাধ পূর্ণ হলো না।

স্বাক্ষর/-
ভারতী রাণী বসু
১৮/৮/৭৩"

বিজয়ের ঠিক পরপরই (১৯/১২/৭১) *দৈনিক পূর্বদেশ* পত্রিকায় *সমীপেষু* কলামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। সে চিঠিতে কাশেফুল হক ও সৈয়দ আলতাফ হোসেন নামক দুই ব্যাক্তি শর্ষিনার পীরের যাবতীয় কুকীর্তি তুলে ধরেন। সেখানেই লেখা ছিল,

"...উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের যাবতীয় মাদ্রাসা সুপার অথবা হেড মাওলানাকে উপস্থিত করিয়া মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্রকে লইয়া রাজাকার, আলবদর, আলশামস গঠন করে এবং ছাত্রদিগকে আগ্নেয়াস্ত্র ট্রেনিং দিয়ে বাঙালি নিধনের এবং বাঙালি বাহিনীর পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে বাধ্য করে। .....এই কুখ্যাত ভন্ড পীর হিন্দুদের মাল সম্পত্তি এবং হিন্দু মেয়েদেরও (মালে গনিমত) যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে ফতোয়া দেয়। রাও ফরমান আলী, ড. মালেক বহুবার এই কুখ্যাত পীরের ঢাকাস্থ ৫৬/এ প্যারিদাস রোডের বাসায় আসিয়া শলাপরামর্শ করিত।"

পরবর্তীতে, ১৯৭২ এর প্রথম সপ্তাহে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানুয়ারির ৫ তারিখে *দৈনিক পূর্বদেশ* এ সংক্রান্ত খবর ছাপায়। এখবরে তাদের অপকর্মের যাবতীয় ফিরিস্তি ফুটে উঠে। খবরে বলা হয়,

"নরঘাতক টিক্কা খানের আমলে ঢাকার ফরাসগঞ্জের লালকুঠিতে যে সকল পীর, মাদ্রাসার মোহাদ্দেস-মোদাররেস ও দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক রাজাকার বাহিনী গঠন করা, প্রতিটি মাদ্রাসাকে রাজাকার ক্যাম্পে পরিণত করা এবং সকল মাদ্রাসার ছাত্রকে রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় শর্ষিনার পীর সাহেব তাদের অন্যতম।

শর্ষিনার পীর সাহেবের দাওয়াতে হানাদার বাহিনী বরিশালের বিভিন্ন স্থানে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং অগ্নি সংযোগ ও লুট করে এবং শর্ষিনা মাদ্রাসার ৫ শতাধিক তালেবে এলেম প্রায় ৩০টি গ্রামে হামলা চালায় এবং বাড়ি ঘর ও বাজার লুট করে কয়েক কোটি টাকার সোনা, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র ও নগদ টাকা এনে পীর সাহেবের "বায়তুল মালে গনিমত হিসেবে জমা দেওয়া হয়। তারা হিন্দুদের বাড়ির ভিটা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

পীর সাহেবের নির্দেশেই তালেবে এলেম রাজাকার এবং হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের একমাত্র পেয়ারা সরবরাহকারী হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল আটঘর, কুড়িয়ানা ও ধলারে পাঁচ দিক থেকে একযোগে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা, শিশুকে হত্যা করে এবং তাদের সর্বস্ব লুট করে। সেখানে বাড়ি-ঘরের তেমন চিহ্ন নেই। মাদ্রাসার ছাত্র রাজাকার সেখানে লোহার রড, লাঠির সাহায্যে হত্যা করা ছাড়াও জঙ্গল ও ধান ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারা প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক ধরে এনে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা

করতো।

গত রোজার শেষের দিকে পীর সাহেবের নির্দেশক্রমেই হানাদার বাহিনী ৬ দিক থেকে হামলা চালিয়ে স্বরূপকাঠির শিল্প শহর ও বন্দর ইন্দরহাট পুড়িয়ে দেয়। এবং প্রায় এক হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করে। তবে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধে এখানে ২২ জন হানাদার সৈন্য ও শর্ষিনার রাজাকার নিহত হয়। এখানকার স্থানীয় তরুণদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই ছিল মুক্তিবাহিনী ও মাদ্রাসার কয়েকজন স্থানীয় ছাত্রও মুক্তিবাহিনীতে সদস্য ছিল। গত নয় মাস কাল শর্ষিনার পীরের বাড়ি ছিল হানাদার বাহিনীর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এখানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য ও পাঞ্জাবি পুলিশ অবস্থান করে বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালায় এবং রাজাকার ট্রেনিং দান করে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের জন্যে পরে এখানে স্বরূপকাঠি থানা স্থানান্তরিত করা হয়।

বর্তমানে শর্ষিনার রাজাকার এবং দালালরা মুক্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তবে পীর সাহেবের অনেক সাঙ্গপাঙ্গ ঢাকা, বরিশালে ও অন্যান্য শহরে আগোপন করে আছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমল থেকে শর্ষিনা গণ-বিরোধী চক্রের একটি শক্তিশালী আখড়া ছিল।"



গণহত্যার ঘৃণ্য নায়ক
শর্ষিণার পীর গ্রেফতার

(স্টাফ রিপোর্টার)

শর্ষিণার পীর আবু সালেহ মোহাম্মদ জাফর ধরা পড়েছেন। গত শনিবার পয়লা জানুয়ারী শর্ষিণা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে বরিশাল সদরে নিয়ে যাওয়া হয়।

গত ১২ই নবেম্বর ৫ শতাধিক রাজাকার, দালাল ও সাঙ্গপাঙ্গসহ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে তখন থেকে পীর সাহেবকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

উল্লেখ্য, নরঘাতক টিক্কা খানের আমলে ঢাকার ফরাসগঞ্জের লালকুঠিতে যে সকল পীর, মাদ্রাসার মোহাদ্দেস-মোদাররেস ও দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক রাজাকার বাহিনী গঠন, প্রতিটি মাদ্রাসাকে রাজাকার ক্যাম্পে পরিণত করা এবং সকল মাদ্রাসা ছাত্রকে রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় শর্ষিণার পীর সাহেব

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন)

...বদর বাহিনীর
পৃষ্ঠপোষক
গ্রেফতার

ঢাকা, ৪ঠা জানুয়ারী (বিপিঅই)।— আজ বিকেলে গেরিলা শিবির থেকে প্রাপ্ত সূত্রে জানা গেছে যে, কুখ্যাত

এই পীরকে আমরা স্বাধীনতা পদকের মালা পরিয়ে দিয়েছি দু দুবার...এখনো কেউ, এমনকি কোন সরকারই সাহস পায়নি এই পদক কেড়ে নেয়ার! এই লজ্জা কোথায় রাখি?

অবশ্য এই শুধু পীরেরাই না, এমন সব ধর্মীয় ফতোয়াতে তখন যোগ দিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকও। *একাত্তরের ঘাতক ও দালাল কে কোথায়* গ্রন্থে এমন একজন অধ্যাপকের কথাই বলা আছে। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আহমদ হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সামনে জনসম্মুখেই বলেছিলেন:

"পাকিস্তানি বাহিনী যদি বাঙালি নারীদের শ্লীলতাহানি করে তবে তাদের কোন পাপ হবে না, কারণ ইসলাম রক্ষার জন্য জেহাদে নিয়োজিত। তাদের জন্য এই কাজ মুতা বিবাহের পর্যায়ে পড়ে"। তার এই বক্তৃতার খবর ১৯৭২ এর ২৬ এপ্রিল *দৈনিক গণকণ্ঠ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গুরু মওদুদী

জামায়াতে ইসলামীর প্রধান এই কুখ্যাত মাওলানা মওদুদী পাকিস্তান আমল থেকেই খোদ পাকিস্তানেই একজন বিতর্কিত চরিত্র, ১৯৫৩ সালে কাদিয়ানীদের ওপর হত্যাকাণ্ড চালানোর অভিযোগে ফাঁসিরও আদেশ হয়েছিল তার। পরে সৌদির বাদশাহর হস্তক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড রদ করা হয়। একাত্তরে তার দল জামায়াতে ইসলামী শুরু থেকেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষ নিয়ে কাজ করা শুরু করে এবং ধর্মীয় গুরু হিসেবে তিনি এ ব্যাপারে ফতোয়া দেয় শুরু করেন। একদিকে তিনি জেহাদ ফরজ বলে ফতোয়া দিচ্ছিলেন, অপরদিকে আরব দুনিয়ায় তার পরিচিতি ও প্রভাব খাটিয়ে পাকিস্তানিদের পক্ষে সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। এই সমর্থন আদায়ের জন্যে তিনি পাকিস্তানিদের আক্রমণটাকে ইসলাম ধর্মোদ্ধারের আন্দোলন বলে চালিয়ে দেন। ৬ সেপ্টেম্বরে প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে মাওলানা মওদুদীর যে বিবৃতি *সংগ্রামে* ছাপা হয় তা নিম্নরূপঃ

"জামায়াতে ইসলামের আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী জনগণকে জেহাদের বাণী পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এর বলেই ভারতীয় বাহিনীকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয় ও আমরা আমাদের স্বদেশ-ভুমি রক্ষা করতে সমর্থ হই।"

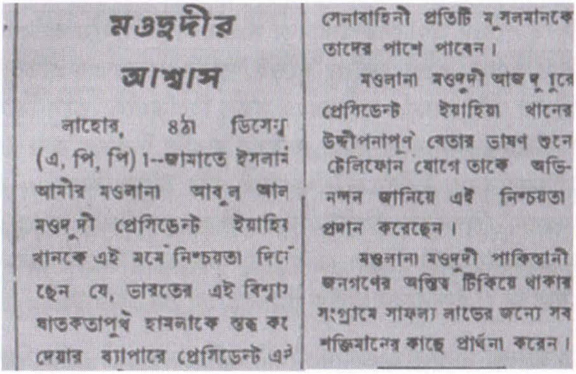
২৯ নভেম্বর *দৈনিক সংগ্রাম* মওদুদীর লেখা এক নিবন্ধ প্রকাশ করে, যেখানে তিনি সরাসরি জিহাদ এর ডাক দেন। সে প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলঃ *আক্রান্ত হলে জেহাদ ফরজ হয়ে যায়*।

"গত কিছুদিন থেকে হিন্দুস্থানি সৈন্যরা পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আসছে। তারা আমদের ভূখণ্ডের বিভিন্ন বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কোরআন আমাদেরকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করে যে, সংখ্যাধিক্য বা সাজসরঞ্জামের প্রাচুর্যের দ্বারা মুসলমানদের শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় না বরং সত্যের উপর দৃঢ়তা এবং দৃঢ়তার উপর পূর্ণ আস্থার দ্বারাই নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে ২০ জন যদি ধৈর্যশীল হয় তবে তারা দশ জনের উপর জয়লাভ করবে আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে ১০০ জন ধৈর্যশীল হয় তবে এক হাজার জনের উপর জয়লাভ করবে"।

লেখাটার মধ্যে তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত প্রসঙ্গ এনেছেন এবং আল্লাহর

প্রসঙ্গ এনেছেন; কিন্তু কেন? ত্রিশ লক্ষ বাঙালি নিধনের বৈধতা দানের জন্য এবং ছয় লক্ষ নারীকে ধর্ষণকে জায়েজকরার জন্যই মাওলানা মওদুদী এভাবেই ধর্মকে টেনে এনেছেন বারবার। কখনো কখনো প্রেসিডেন্টকে আশ্বাস দিয়েছেন মুসলমানরা সেনাবাহিনীর পাশে থাকবে বলে; সেই সেনাবাহিনী -যারা নির্দ্বিধায় একজন নারীকে এক রাতে ৮০ বার ধর্ষণ করতে পারে, যারা মসজিদের ভিতরেও ধর্ষণ করতে পারে! মওদুদীর এই দেখানো পথে ধর্মের ব্যবহার তার অনুসারীরা এখনো চলছে! আজকের বাংলাদেশেও নিয়মিত দেখা যায় এমন চিত্র।

বিজয় তখন সন্নিকটে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৪ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে বেতারে ভাষণ দেন। প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ শুনে আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে জামায়াতের প্রধান মওদুদী টেলিফোন করে প্রেসিডেন্টকে আশ্বাস দেন যে, সেনাবাহিনীর পাশে সবসময় প্রতিটা মুসলমান থাকবে। *দৈনিক পূর্বদেশ* ৫ ডিসেম্বরে *মওদুদীর আশ্বাস* শিরোনামে এই খবর প্রকাশ করে।



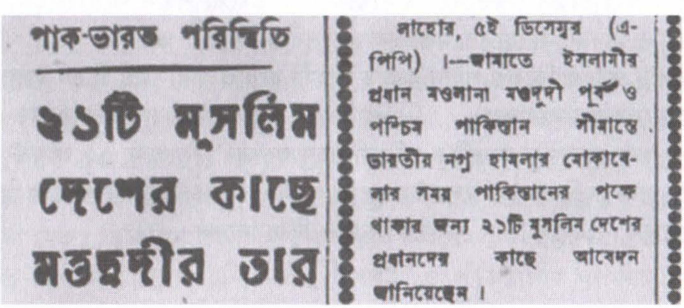
মওদুদীর আশ্বাস

লাহোর, ৪ঠা ডিসেম্বর (এ, পি, পি)।—জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, ভারতের এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হামলাকে স্তব্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট এই সেনাবাহিনী প্রতিটি মুসলমানকে তাদের পাশে পাবেন।

মওলানা মওদুদী আজ দুপুরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উদ্দীপনাপূর্ণ বেতার ভাষণ শুনে টেলিফোন যোগে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

মওলানা মওদুদী পাকিস্তানী জনগণের অস্তিত্ব টিকিয়ে থাকার সংগ্রামে সাফল্য লাভের জন্যে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করেন।

মওদুদী ভারতের পক্ষ নেয়ার জন্যে ইহুদিদের নিন্দা করে এবং পাকিস্তানের পাশে থাকার জন্যে মুসলিম দেশসমুহের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। ৬ ডিসেম্বরের *পূর্বদেশ* এ খবর জানায়। তিনি ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য জনসাধারণকেও আহ্বান জানান এই খবরে।



পাক-ভারত পরিস্থিতি

২১টি মুসলিম দেশের কাছে মওদুদীর তার

লাহোর, ৫ই ডিসেম্বর (এ-পিপি)।—জামাতে ইসলামীর প্রধান মওলানা মওদুদী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় নগ্ন হামলার মোকাবেলার সময় পাকিস্তানের পক্ষে থাকার জন্য ২১টি মুসলিম দেশের প্রধানদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

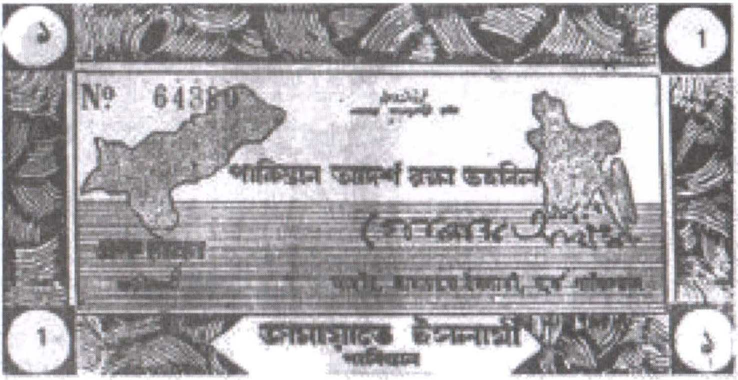
বিজয়ের পূর্বেই গোলাম আযমরা দেশ ছেড়ে চলে পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নেন, তারপর মওদুদী তাদেরকে পাঠিয়ে দেন সৌদিতে। সেখানে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন পত্রিকায় ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে এমনসব বক্তব্য প্রদান করে ইসলাম রক্ষার জন্যে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়েছিল।

আমীর গোলাম আযম

১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে গ্রেপ্তারকৃত কয়েকজন আলবদরের কাছ থেকে বেশ কয়টা দলিলপত্র উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে একটা নির্দেশমালা ছিল আরবিতে লেখা, "আপনারা পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্যেই কেবল যুদ্ধ করছেন না, -এ যুদ্ধ ইসলামের। নমরুদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের আমীরের নির্দেশ পালন করুন"। [*একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*]

এই "আমীর"ই হচ্ছেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সময়ে আরেক জঘন্যতম ব্যক্তি; গোলাম আযম। পুরো একাত্তর জুড়েই *দৈনিক সংগ্রাম* এর প্রতিটা পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল তাঁর বিবৃতি আর ভাষণ। শুধুমাত্র এ সকল বিবৃতিগুলো তুলে দিলেই আমরা দেখতে পাব তিনি কেমন করে ধর্মীয় লেবাসে বাঙালি নিধণের কথা বলেছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত শিক্ষকদের প্রতি ইঙ্গিত করে ৩০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষকের উপরই সঠিক শিক্ষাদান নির্ভর করছে, শিক্ষকরা পাকিস্তানের আদর্শের খাটি বিশ্বাস না হলে তাদের কাছে থেকে গঠনমূলক কিছুই আশা করা যায় না। [*একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*]

পাকিস্তানের আরেক দালাল মাওলানা মাদানী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হওয়ার পর *দৈনিক সংগ্রাম* বেশ বড় করে এ নিয়ে খবর প্রকাশ করে। এতে গোলাম আযম, মওদুদী, নিজামীরা সবাই বিবৃতি দেন। গোলাম আযম সেখানে বলেন, 'ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলমানদের দুশমন তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকরা আর যাই হোক দেশের ভালো ভালো সৎ লোক, ইমানদার লোক, পাকিস্তানের প্রতি অনুগত আস্থাভাজন লোকদের বহুসংখ্যককে ইতিমধ্যে শহীদ করে ছাড়েনি তারা মাওলানা মাদানী সাহেবের মত একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, বুজুর্গ পীর ও মোখলেছ পাকিস্তানিকেও শহীদ করতে সাহসী হয়েছে যার সমগ্র জীবন ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য ওয়াকফ। .... পাকিস্তান ও ইসলামকে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য জেহাদের আন্তরিক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।' [*সংগ্রাম, ১২ আগস্ট,৭১*] অর্থাৎ, সকল মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ইসলামের দুশমন, কারণ তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন। এজন্যে তিনি জেহাদের ডাকও দিয়ে দিলেন।



১৪ আগস্ট আজাদী দিবস উপলক্ষে কার্জন হলের এক সভায় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "আল্লাহ না করুন,যদি পাকিস্তান না থাকে, তাহলে বাঙালি মুসলমানদের অপমানের মৃত্যু করতে হবে"। বাক্যটা খেয়াল করে দেখেন, খুব সুন্দর করে আবারো ইসলাম ও পাকিস্তানকে গুলিয়ে ফেলা হল। [*একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*]

ঐদিনই আরেক সভাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে বলেন, বাংলাদেশ বাঙালি দ্বারা শাসিত হবে এই মতবাদ শেখ মুজিব বা শ্রী তাজুদ্দিনের। এ জন্যেই তথাকথিত বীরেরা পশ্চিম বঙ্গে গিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করেছে। কিন্তু মুসলমান আল্লাহর হুকুম পালন করার সুযোগ লাভকেই সত্যিকারের আজাদী মনে করে। [*সংগ্রাম, ১৬আগস্ট,১৯৭১*]

১৮ আগস্ট *দৈনিক সংগ্রামে* প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে নিয়ে লিখেন, 'হিন্দুদের সাথে এক জাতি হয়ে এবং হিন্দু ভারতকে বন্ধু মনে করে অদূরদর্শী কতক মুসলিম নেতা বাঙালি মুসলমানদেরকে সর্বক্ষেত্রে বহু পেছনে ঠেলে দিয়েছে'। তিনি বিভিন্ন জায়গাতে এমনও কথা বলেন যে, বাংলাদেশে কখনো মুসলমান ও ইসলামের জায়গা হবে না। যুদ্ধের ৪৫ বছর পর আমরা দেখছি বাংলাদেশ ইসলাম ও মুসলমান আছে কি না? আলবদর, আলশামস গঠনের পর তার একটা নিয়মিত কাজ ছিল বিভিন্ন ট্রেনিং কলেজ কিংবা হেডকোয়ার্টারে ঘোরাঘুরি করা এবং ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে হিংসাত্মক বক্তৃতা ভাষণ দেয়া। রাজাকাররা মুক্তি বাহিনীর হাতে মারা পড়লে তাকে শহীদ-আলেম উলামা আখ্যায়িত করা হত এবং হিন্দুরা যে তাদেরকে মেরে ফেলে দিচ্ছে, খতম করে দিচ্ছে বিনিময়ে প্রয়োজন প্রতিশোধ এ ধরনের কথা হারহামেশাই তার কাছ থেকে শোনা যেত। তিনি অনুপ্রেরনা দিতেন বাঙালি নিধনে। ১৭ সেপ্টেম্বর এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন কালে তিনি বলেন, ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনরা আলেম

ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে একথাই প্রমাণ করেছে যে, এসব লোককে খতম করলেই পাকিস্তানকে ধ্বংস করা যাবে। [*একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*]

গোলাম আযম ঘন ঘন বিভিন্ন বক্তৃতায় কালেমার ঝাণ্ডা উঁচু রাখার জন্য রেজাকারদের কাজ করার আহ্বান জানাতেন এবং সেই সাথে "যে পাকিস্তানের দুশমন সে ইসলামেরও দুশমন" বলে ঘোষণা দিতেন। রাজাকারদের শিবির পরিদর্শনকালে এক ভাষণে সত্যিকারের মুসলামানরাই পাকিস্তানের প্রকৃত সম্পদ বলে উল্লেখ করেন। [*১৭, ১৮, ১৯ সেপ্টেম্বরের দৈনিক সংগ্রাম*]

আলবদরদেরকে উৎসাহ দিতেন এই বলে যে, এ পথে থাকলে আল্লাহর কাছে সত্যিকারের মুজাহিদের পদ পাওয়া সম্ভব। সবাইকে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে থাকার আহ্বান জানান। সর্বদা এই ভয় সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করতেন যে পাকিস্তান না থাকলে মুসলমানরাও টিকবে না। ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পাকিস্তানকে মুসলিমের ঘর এর সাথে তুলনা করে বলেছিলেন, জামাতে ইসলামী পাকিস্তান ও ইসলামকে এক ও অভিন্ন মনে করে। পাকিস্থান সারা বিশ্বের মুসলমানের ঘর। কাজেই পাকিস্তান যদি না থাকে তাহলে জামাত কর্মীরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন স্বার্থকতা মনে করে না। (২৬ *সেপ্টেম্বর, দৈনিক সংগ্রাম*)


সম্বর্ধনা সভায় অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষণ

ইসলামী ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও সেবাই মন্ত্রীদের দায়িত্ব হওয়া উচিত

পূর্বেও উল্লেখ করেছি, মওদুদীর নির্দেশেই গোলাম আযম ১৯৭২ সালে পাকিস্তান ছেড়ে হজ্জ করার জন্য জেদ্দা গমন করেন। বিভিন্ন আরব দেশ ঘুরে ১৯৭৩ সালে লন্ডন পাড়ি জমান এই কুখ্যাত খুনি। ১৯৭৬ সালে যখন বলা হয়েছিল যে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে তারা আবেদন করতে পারবেন, তখনই গোলাম আযম নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য দরখাস্ত করেন। তার নেতৃত্বেই ১৯৭৯ সালে ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে সময়েও তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের আদর্শ কি সে ধারণা আমার নেই। শুধু জানি বাংলাদেশ

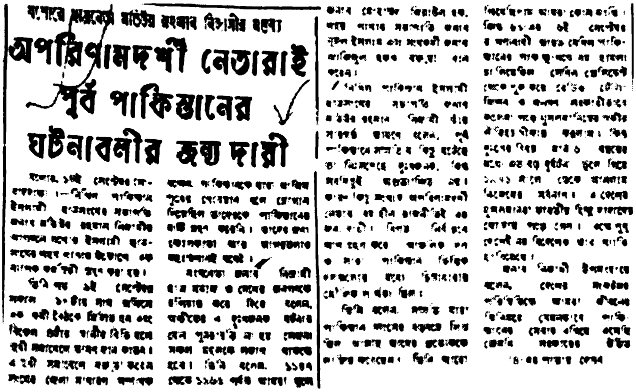
একটা জমি, একটা মাটি। মাটির কোন আদর্শ থাকে না। [*বিচিত্রা, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮১*] এটা পুরো জাতির জন্যে লজ্জার যখন দেখি এই লোকটা মারা যাওয়ার পর লোকের ঢল নেমেছিল তার জানাযায়, যখন দেখি এই বাংলার বাঙালিরা বয়সের অজুহাত দেখিয়ে তার পক্ষে গান গায় আমার অনুভূতি গুলো তখন বেশ কষ্ট পায়, আমার অনুভূতিগুলো তখন কেঁদে ওঠে।

রুমি- আজাদের রক্তে রঞ্জিত নিজামী

জামায়াত ইসলামী তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ (বর্তমান নাম ইসলামী ছাত্র শিবির) এর প্রধান এবং আল বদরের চিফ মতিউর রহমান নিজামী পুরো একাত্তর জুড়েই তার কার্যকলাপ চালিয়েছেন, বদি রুমি জুয়েলসহ হাজার হাজার বাঙালির রক্তে তিনি রঞ্জিত হয়েছেন। পুরো নয়টা মাস জুড়েই সরাসরি গণহত্যাকে নিজে সমর্থন দিয়েছেন এবং অন্যান্য নিরীহ বাঙালিদের সমর্থন আদায়ে ব্যবহার করেছেন ধর্মকে। তার যাবতীয় কার্যকলাপের বিবরণ তৎকালীন দৈনিক সংগ্রামের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আজাদী দিবসের এক সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন, "পাকিস্তান কোন ভূখণ্ডের নাম নয়, একটি আদর্শের নাম। এই ইসলামী আদর্শের প্রেরণাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে এবং এই আদর্শই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। ইসলাম প্রিয় ছাত্রসমাজ বেঁচে থাকলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকবে।" [১৬ *আগস্ট, সংগ্রাম*]

আগেই উল্লেখ করেছি দালাল মাওলানা মাদানীর মৃত্যুর পর জামায়াতের সকলেই বিবৃতি দেয়া শুরু করেন; নিজামীও করেছিলেন সেদিন। মাদানীর এক স্মরণ সভায় নিজামী বলেন, "পাকিস্তানকে যারা বিচ্ছিন্ন করতে চায় তারা এ দেশ থেকে ইসলামকেই উৎখাত করতে চায়"। [২৩ *আগস্ট, সংগ্রাম*]

১৪ সেপ্টেম্বর যশোরে ছাত্রসংঘের এক সভায় নিজামী বলেন, "সম্প্রতি যারা পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে লাঞ্ছিত করেছেন। পাকিস্তানকে যারা আজিমপুরের গোরস্তান বলে স্লোগান দিয়েছিল তাদেরকে পাকিস্তানের মাটি গ্রহণ করেনি। তাদের জন্যে কোলকাতা কিংবা আগরতলা মহাশশ্মানই যথেষ্ট। আমাদের প্রত্যেককে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান সৈনিক হিসাবে পরিচিত হওয়া উচিত এবং মজলুমকে আমাদের প্রতি আস্থা রাখার মত ব্যবহার করে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে ঐ সকল ব্যাক্তিকে খতম করতে হবে। যারা সশস্ত্র অবস্থায় পাকিস্তান ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। " যশোরের সে সভায় তিনি কোরআনের বিভিন্ন আয়াত তাফসীর করে রাজাকারদেরকে তাদের ইমানী দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দেন। তার সে ভাষণ নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর *দৈনিক সংগ্রাম* রিপোর্ট প্রকাশ করে 'অপরিণামদর্শী নেতারাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী' শিরোনামে।


অপরিণামদর্শী নেতারাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী

২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র সংঘের এক মিটিংয়ে বলেন, ‘যারা ইসলামকে ভালোবাসে, শুধুমাত্র তারাই পাকিস্তানকে ভালোবাসে। এইবারের উদ্‌ঘাটিত এই সত্যটি যাতে আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সেজন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে’। [*একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*]

পাকিস্তানকে নিজামী বারবার আল্লাহর ঘরের সাথে তুলনা দিতেন, আল্লাহর ঘর বিপণ্ন ধোঁয়া তুলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি এবং গণহত্যাকে প্রভাবিত করতেন। নভেম্বরের দিকে নিজামী বলেন, “খোদাবী বিধানে বাস্তবায়নের সেই পবিত্র ভূমি পাকিস্তান আল্লাহর ঘর। আল্লাহর এই পূত পবিত্র ঘরে আঘাত হেনেছে খোদাদ্রহী কাপুরুষের দল। ”[*১৬ নভেম্বর, সংগ্রাম*]

এবার যুদ্ধাপরাধী নিজামীর মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় নিয়ে বলি। নিজামী'র পুরো রায় জুড়েই ডিফেন্স পক্ষ একটা জিনিসই বলতে চেয়েছেন খুব জোর দিয়ে; নিজামী ১৯৭১ এর পুরোটা সময় না, শুধুমাত্র ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্তই পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান ছিলেন। অতএব, নভেম্বর - ডিসেম্বরে বদর বাহিনীর হাতে নিহত হওয়া বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপারে তার কোন সম্পৃক্ততা নাই।

মজার বিষয়টা হচ্ছে, বদর বাহিনী তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের ছেলেপেলে দিয়েই তৈরি হয়েছিল এবং ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যাবতীয় কিছুর দায়ভার নিজামীর-এই বিষয়টা কিন্তু ডিফেন্স পক্ষের কেউই অস্বীকার করেন নি। বদর বাহিনীর সাথে নিজামীর সম্পৃক্ততা প্রমাণের জন্য প্রসিকিউশন হাজির করে জোরালো এক প্রমাণ, ১৯৭১ সালের ১৪ নভেম্বর '*দৈনিক সংগ্রাম*' এ প্রকাশিত নিজামীর লেখা '*বদর দিবসঃ পাকিস্তান ও আলবদর*' শিরোনামের এক প্রবন্ধ।
"হিন্দু বাহিনীর সংখ্যাশক্তি আমাদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশী। তাছাড়া আধুনিক সমরাস্ত্রেও তারা

পাকিস্তানের চেয়ে অধিক সুসজ্জিত। দুর্ভাগ্যবশত: পাকিস্তানের কিছু মুনাফিক তাদের পক্ষ অবলম্বন করে ভেতর থেকে আমাদেরকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের মোকাবিলা করেই-তাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করেই পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে।

বদর যুদ্ধ থেকে অনেক কিছুই আমাদের শিখবার আছে। এই যুদ্ধের সৈনিকরা কেউ পেশাদার বা বেতুনভূক সৈনিক ছিলেন না। মুসলমানরা সবাই ছিলেন সৈনিক, তারা সবাই ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, ইমানের তাগিদেই তারা লড়তে প্রস্তুত হয়েছিলেন বিরাট শক্তির মোকাবিলায়। বৈষয়িক কোন স্বার্থ ছিলনা তাদের সামনে। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী এই ছিল তাদের বিশ্বাসের অঙ্গ। আল্লাহর সন্তোষ ছিল তাদের কাম্য। আজকের কাফেরদের পর্যদুস্ত করতে হলে আমাদের মধ্যেও অনুরূপ গুনাবলীর সমাবেশ অবশ্যই ঘটাতে হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাক সেনার সহযোগিতায় এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ সমাজ বদরযুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে।

পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আলবদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচি দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। আমাদের বিশ্বাস সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয় যে দিন আল বদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে হিন্দুস্থানের অস্তিত্বকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে" ।


জনতার পার্লামেন্ট

বদর দিবস : পাকিস্তান ও আলবদর

মতিউর রহমান নিজামী

আদালত পরে মন্তব্য করেছিলেন, "This single piece of document is enough to hold that accused Motiur Rahman Nizami was not only a High Command of Al-Badr Bahini, he was also a mastermind for forming the said Bahini in 1971, during the Liberation War and he had complicity with the Al-Badr Bahini even after September, 1971."

স্বাধীন দেশে এই নিজামী আমাদের মন্ত্রী হয়েছিল, আমাদের স্বাধীন বাংলার সংসদেও পদার্পণ করেছিল, তার গাড়িতে উড়েছিল লাল সবুজের পতাকা... সে পতাকা সেদিন পতপত করে উড়েছিল কি না জানি না, তবে এটা নিশ্চিত যে, রুমি

জুয়েল, বদিদের আত্মাটা সে সময় ঢুকরে কেঁদে উঠেছিল!

মুজাহিদ ও তার বিস্ময়কর 'বদর'

ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা এবং একাত্তরে বদর বাহিনীর প্রধানদের একজন আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সবচেয়ে আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে একজন। তিনি প্রতিটা সভা সমাবেশে সরাসরি জেহাদ এর ডাক দিয়ে হিন্দু নিধনের আহ্বান জানাতেন। বদর দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে ২৫ অক্টোবর মুজাহিদ এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা আজ ইসলাম বিরোধী শক্তি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই পবিত্র দিবসে আমরা জাতির স্বার্থে এবং এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করব। *[একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়]*

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ 'মুজাহিদ' পরিচয়ে জামায়াতের মুখপত্র ঢাকার *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকায় ১৫ সেপ্টেম্বর *অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র: যুক্তি নয়* শিরোনামে এক উত্তেজনামূলক এক নিবন্ধ লিখেন। সেখানে তিনি লিখেন, 'তথাকথিত মুক্তি আন্দোলনের শ্রুতিমধুর কথা শুনে প্রথম দিকে এ দেশের কোনো কোনো মানুষ বিভ্রান্ত হলেও নিরপেক্ষ জনতা, ওয়ালাম, পীর মাশায়েখ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হত্যা ও যোগাযোগ সেতু ধ্বংস করা দেখে সকলেই এখন বুঝতে পেরেছে যে, এ আন্দোলন মুক্তির নয়। হিন্দুদের গোলাম বানানোর আন্দোলন এবং এখান থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের খতম করে এটাকে স্পেন বানাবার আন্দোলন।   দুষ্কৃতিকারী দাললরা যদি নিরপরাধ মুসলমানদেরকে বিশেষ করে আলেম ওলামা ও সমাজের বিশিষ্ট লোকদেরর হত্যা করতে পারে তাহলে ইসলাম ও পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য পাক সেনাবাহিনীর সহযোগীতা করে যারা অপরাধ করেছে তাদেরকে যে তারা কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করবে না এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং বেইমানদের হাতে ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য মরতে হলে এভাবে মরার চাইতে আল্লাহর সৈনিক অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের ভাষায় হিজবুল্লাহর হয়েই মরা সবচাইতে উত্তম। ...'

একসাথে 'ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষা'র কথা বলে এখানে মুজাহিদ মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবেই চিহ্নিত করছেন। আবার, দুষ্কৃতি, মানে মুক্তিযোদ্ধা দ্বারা মুসলমান হত্যা এবং ইসলাম খতম করার কথা বলা হচ্ছে। বাংলার মুসলমানদের আসলে কারা হত্যা করছিল সেটা এখন আর কারো অজানা নয়। সেই সাথে তাদের ভাষায়, মুক্তিযুদ্ধ কোন মুক্তির আন্দোলন ছিলনা, বরং হিন্দুদের গোলাম বানানোর আন্দোলন ছিল। এমন উত্তেজনাকর বিদ্বেষপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে মুজাহিদ বাংলার মুসলমান-হিন্দুদের মুখোমুখি দাড় করানোর চেষ্টা করেছেন। আবার, পাকিস্তানের জন্যে কেন লড়তে হবে সেটারও একটা ধর্মীয় ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে এখানে, যেমন দালালদের আখ্যায়িত করা হচ্ছে আল্লাহর সৈনিক

হিসেবে।



অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র—যুক্তি নয়

৭ নভেম্বর বেশ ঘটা করে পালন করা হয় বদর দিবস। বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে আয়োজিত সমাবেশ শেষে মিছিলও বের করা সে দিন। সে সমাবেশে আলী আহসান মুজাহিদ ইসলামী ছাত্র সংঘের পক্ষ থেকে ৪ দফা ঘোষণা দেন; দফা গুলো নিম্নরূপ:

১) দুনিয়ার বুকে হিন্দুস্থানের কোন মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্থানের নাম মুছে না দেয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।
২) আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরিতে স্থান দিতে পারবেন না বা বিক্রি বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকেরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।
৩) পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে বিরূপ প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই অপপ্রচার করছে তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকুন।
৪) বায়তুল মোকাদ্দেসকে উদ্ধারের সংগ্রাম চলবে।

এই চার দফা ঘোষণা শেষে তিনি আবার বলেন, 'এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্য শির উঁচু করে, বুকে কোরআন নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন'।

তার এই বক্তৃতার খবর পরেরদিন (৮ নভেম্বর) দৈনিক পাকিস্তান ও সংগ্রাম সহ বিভিন্ন পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। এই চার দফার প্রতিটা লাইন মনোযোগ দিয়ে পড়েন। প্রথম দফাতেই তিনি হিন্দুদেরকে ধুয়ে মুছে ফেলে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন;এটাই বোধহয় সবচেয়ে উগ্র কথাগুলোর একটি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই হিন্দু

কারা? তাদের মনমানসিকতার ধরণে এটা পরিষ্কার যে, এই হিন্দু শুধু ভারতের হিন্দুই না, এখানে বাংলার স্বাধীনতা যারাই চেয়েছিল তারা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় দফাতে এসে আক্রমণ চলে আসে বই পুস্তকাদির উপর এবং প্রতিটা দফাই বাস্তবায়নের জন্য কোরআনকে বুকে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। ধর্মের কী অপূর্ব ব্যবহার!

৩

এমন না যে শুধু এই নেতারাই কিংবা জামায়াতে ইসলামীর নেতারাই এমনভাবে ধর্ম দিয়ে গণহত্যার পক্ষে সাফাই গাইছিলেন; আরো অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন সে তালে; তখনকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর দিকে নজর দিলে এমন ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শান্তি কমিটির আরেক সংগঠক জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান ২৪ সেপ্টেম্বর এক সভাতে ভারতের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন,এই সংকট মূহুর্তে প্রত্যেক পাকিস্তানি নাগরিককে পাকিস্তানি ও মুসলমান হিসেবে চিন্তা করতে হবে। *[একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়]* এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলেন। *[দৈনিক সংগ্রাম]* ৮ নভেম্বর লাহোরে তিনি ঘোষণা দেন, ভারত যদি আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তবে আমরা কোলকাতা ও দিল্লীতে ঈদের নামাজ পড়ব। পূর্ব পাকিস্তানের রাজাকার বাহিনী আলবদরবাহিনী প্রমাণ করে দিয়েছে যে মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করেনা বরং আল্লাহকে ভয় করে। *[দৈনিক সংগ্রাম, ১০ নভেম্বর, ১৯৭১]* বুদ্ধিজীবীর হত্যা শুরু হওয়ার মাত্র কদিন আগে তিনি আবারো আলবদরদের স্মরণ করে দেন ইসলামের বদর যুদ্ধের কথা এবং এর মাধ্যমে হিন্দুসহ সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেয়া হয়।

রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠা মওলানা ইউসুফ ১২ অক্টোবর শান্তি কমিটির এর সংবর্ধনা সভায় কোরআন শরীফের অপব্যাখ্যা দিয়ে শান্তি কমিটির পক্ষে যুক্তি দেখান। কোরআন এর আয়াত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যারা মানুষের শান্তির ব্যাঘাত ঘটায় আল্লাহ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। *[একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়]*

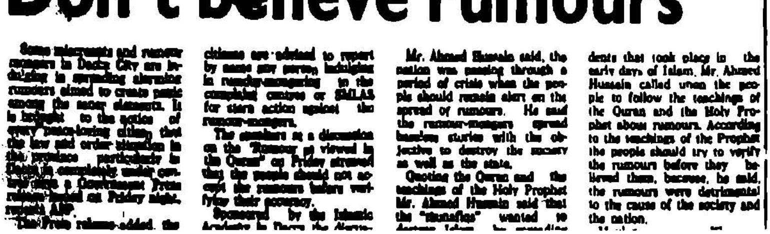
হাফেজ্জি হুজুর নামে পরিচিত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ তখন শুরু করেন খেলাফত আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম প্রিয় লোকদের সামরিক ট্রেনিং দেয়ার আহ্বান জানানো এই লোক পাকিস্তানকে তখন দাবি করেছিলেন মুসলমানদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে।

পাকিস্তানিদের আরেক দালাল মাওলানা মান্নান ২৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, 'সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ আজ জেহাদের জোশে আগাইয়া আসিয়াছে'।

তিনি তখন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি। ২৭ সেপ্টেম্বর নিয়াজীর সাথে দেখা করে তাকে এক কপি কোরআন শরীফ উপহার দিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমরা সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত'। এই মান্নানই পরবর্তীতে *দৈনিক ইনকিলাব* প্রতিষ্ঠা করেন এবং এরশাদের আমলে শিক্ষামন্ত্রীও হয়ে যান।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কন্যা রাইসী বেগমও যোগ দেন পাকিস্তানিদের পক্ষে। ২৬ মার্চকে পাকিস্তানের বিপদমুক্তির দিন উল্লেখ করে তিনি এক বিবৃতি দেন; সেখানে বলেন, "আল্লাহতায়ালা লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত মুসলমানদের সারা রাতের আকুল প্রার্থনা কবুল করেছেন এবং পাকিস্তানকে সমূহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেন, এটা এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের জাতশত্রুদের সহায়তায় পাকিস্তানের ৭ কোটি জনগণের এ অঞ্চলকে বিশ্বনাথ, কালী ও দুর্গার মন্দিরে পরিণত করা ষড়যন্ত্র লিপ্ত ছিলেন"। তিনি আরো বলেন, তারা পাকিস্তানের পাকভূমি থেকে সার্বজনীন ইসলামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আল্লাহু আকবর এর স্থলে শেখ মুজিব পৌত্তলিকদের যুদ্ধের স্লোগান জয় বাংলার আমদানি করেছিলেন। *[দৈনিক সংগ্রাম, ১২ এপ্রিল, ১৯৭১]*

এপ্রিলের দিকে ঢাকায় ইসলামিক একাডেমির উদ্যোগে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়; বিষয় ছিল কোরআনের দৃষ্টিতে গুজব [Rumors as viewed in the Quran]। একাডেমির ডিরেক্টর আহমেদ হুসেইন তার বক্তৃতায় কোরআন ও হাদিস থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, মুনাফিকরা ভুল রিপোর্ট দিয়ে এবং ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করে ইসলাম ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তিনি সবাইকে আল্লাহ ও তার নবীর দেখানো পথে [গুজব বিষয়ে] চলতে উপদেশ দেন। পাকিস্তান অবজারভার ৪ এপ্রিল Don't believe rumors' শিরোনামে এ খবর প্রকাশ করে। Quoting The Quran and the teaching of the holy Prophet Mr. Ahmed Hussain said that, the Munafiqs wanted to destroy Islam by spreading misleading reports.



Don't believe rumours

Some miscreants and rumour mongers in Dacca City are indulging in spreading alarming rumours aimed to create panic among the saner elements. It is brought to the notice of every peace-loving citizen that the law and order situation in this province particularly in Dacca is completely under control, says a Government Press release issued on Friday night, reports APP.

The Press release added the citizens are advised to report by name any person indulging in rumour-mongering to the complaint centres or SMLAS for stern action against the rumour-mongers.

The speakers at a discussion on the "Rumour as viewed in the Quran" on Friday stressed that the people should not accept the rumours before verifying their accuracy.

Sponsored by the Islamic Academy in Dacca the discus-

Mr. Ahmed Hussain said, the nation was passing through a period of crisis when the people should remain alert on the spread of rumours. He said the rumour-mongers spread baseless stories with the objective to destroy the society as well as the state.

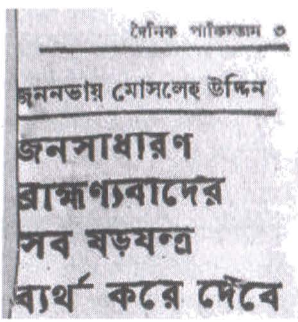
Quoting the Quran and the teachings of the Holy Prophet Mr. Ahmed Hussain said that the "munafiqs" wanted to destroy Islam by spreading

dents that took place in the early days of Islam. Mr. Ahmed Hussain called upon the people to follow the teachings of the Quran and the Holy Prophet about rumours. According to the teachings of the Prophet the people should try to verify the rumours before they believed them, because, he said, the rumours were detrimental to the cause of the society and the nation.

১৬ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামে মওলবী ফরিদ আহমেদের এক বিবৃতি দেন *ভারত মুসলমানদেরকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের গোলাম বানাতে চাচ্ছে* শিরোনামে।

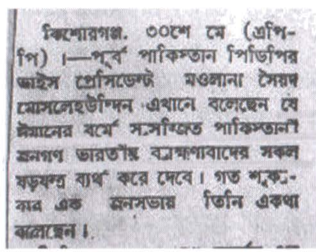
ফজলুল কাদের চৌধুরী এপ্রিল মাসে এক বেতার ভাষণে মুসলমান ভাইদেরকে ইসলাম ও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার আহ্বান জানান। সে ভাষণের পুরোটা জুড়েই ছিল ভারত বিদ্বেষী ও হিন্দু বিদ্বেষী কথাবার্তার ছড়াছড়ি। ভাষণজুড়ে মিথ্যাচার ও উস্কানিমূলক কথাবার্তার তীব্রতা কতটুকু ছিল তা একটু খেয়াল করুন, "আমরা মুসলমানেরা জানি ভারতে বসবাসকারী আমাদের মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হিন্দুরা বিরূপ ব্যাবহার করেছে। মুসলিম হত্যা ভারতের নিত্যকার ব্যাপার। আমরা মুসলমানরা ভারত ও ভারতের দালালদের মিথ্যা ও হীন প্রচারণায় ভুলতে রাজী নই।" *[দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১]*

পূর্ব পাকিস্তান পিডিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন ৩০ মে এক জনসভায় বলেন,   যে ইমানের বর্মে সুসজ্জিত পাকিস্তানি জনগণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে"। তার মানে, পাকিস্তানি জনগন (বিশেষ করে পাকি সেনা) সবাই ছিল ইমানদার এবং তাদের বিরুদ্ধে যারাই আন্দোলন করেছিল তারা সকলেই ছিল হিন্দু! *[দৈনিক পাকিস্তান]*


দৈনিক পাকিস্তান ৩

জনসভায় মোসলেহ উদ্দিন

জনসাধারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে


কিশোরগঞ্জ, ৩০শে মে (এপিপি)।—পূর্ব পাকিস্তান পিডিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট মওলানা সৈয়দ মোসলেহউদ্দিন এখানে বলেছেন যে ঈমানের বর্মে সুসজ্জিত পাকিস্তানী জনগণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে। গত শুক্রবার এক জনসভায় তিনি একথা বলেছেন।

নভেম্বর শেষ হওয়ার পথে; বিজয় তখন সন্নিকটে। নেজাম ইসলাম নেতা মওলানা আশরাফ আলী তখন এক সমাবেশে জেহাদের ঘোষণা করে বলেন যে, ভারতীয় হামলার ফলে মুসলমানদের ওপর বর্তমানে জেহাদ ফরজ হয়ে পড়েছে। তার আহ্বানের খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামের ৩০ নভেম্বরে। শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান এক বেতার ভাষণে জেহাদের জন্যে তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান। তার সে ভাষণ প্রকাশিত হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর পত্রিকায়। এই আব্বাস আলী খান ১৯৮০ সালে দলের হয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, ১৯৭১ সালে দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য যা করেছি ঠিকই করেছি ভারতীয় আগ্রাসনের হাত থেকে জনগণকে হেফাজত করার জন্য। একাত্তরে বাংলাদেশের কনসেপ্ট সঠিক ছিলনা

বলেও বিভিন্ন বক্তৃতায় বলেন।

সমাপনী

পূর্বেই বলেছি, পাকিস্তানিরা বরাবরই চেয়েছিল বাঙালিদের কলোনি করে রাখতে এবং সে কাজে ডান হাত হিসেবে পেয়েছিল বাংলার ইসলামী দলগুলোকে কিংবা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা দলগুলোকে। এই দলগুলোর উদ্দেশ্যও বেশ পরিষ্কার ছিল - সামরিক বাহিনীকে তোষামোদ করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় এবং যে কোন ধরণের ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ। সে জন্যে তারা পুঁজি করে নিয়েছিল ধর্মকে। একাত্তরের পরবর্তী সময়ে দেখা যায় এই দালালরাই আবারো বাংলার বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে; সেখানেও পুজি ছিল যথারীতি ধর্ম। ওয়াজ মাহফিলে কিংবা মিলাদুন্নবী, শবে বরাত ইত্যাদি ইসলামিক অনুষ্ঠানসমূহে তাদের সরব উপস্থিতির মাধ্যমে তারা আবারো ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠেন বাংলার রাজনীতিতে; রাজাকার সাইদি, শর্ষিনার পীর, মাওলানা মান্নানরা এর উপযুক্ত প্রমাণ। সাইদি ওয়াজের মাধ্যমে এবং মান্নান ইনকিলাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বোধহয় রাজনীতিতে পরবর্তী সময়ে ধর্মকে সবচেয়ে নোংরাভাবে টেনে এনেছিলেন। এই ধারাটা এখনো টিকে আছে বহাল তবিয়তে। আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে কলংকজনক অধ্যায় হচ্ছে এই দালালদের এ দেশে সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে পূনর্বাসনের সুযোগ করে দেয়া, যার মাশুল দিতে হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশকে এবং আরো দিতে হবে ভবিষ্যতে। এটা ঠিক জাতি ধীরে ধীরে কলঙ্কমুক্ত হচ্ছে, কিন্তু এই দালালরা গত ৪৫ বছরে তৈরি করে ফেলেছে তাদের মতাদর্শী পুরো নতুন একটা প্রজন্ম যাদের নখের আঁচড় এখনো দাগ কেটে দিচ্ছে বাংলাকে, বাংলার পতাকাকে, বাংলার চেতনাকে।

তথ্যসূত্র

১) পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে একাত্তর - মুনতাসীর মামুন
৩) মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিল - মুনতাসীর মামুন
৪) অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সামরিকজান্তা ও তার দোসরদের অপতৎপরতা - সুকুমার বিশ্বাস
৫) একাত্তরের দালালনামা - ইফতেখার আমীন
৬) মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ - মুনতাসীর মামুন
৭) একাত্তরের ঘাতক ও দাললরা - আজাদুর রহমান চন্দন
৮) শান্তি কমিটি ১৯৭১ - মুনতাসীর মামুন
৯) ঘাতকের দিনলিপি - রমেন বিশ্বাস
১০) রাজাকারের মন - মুনতাসীর মামুন
১১) পাকিস্তানি জেনারেলদের মন - মুনতাসীর মামুন
১২) মুক্তিযুদ্ধের দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা-আলী আকবর টাবী
১৩) আলবদর-মুনতাসির মামুন
১৪) একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়
১৫) ১৯৭১ ঘাতক-দালালদের বক্তৃতা ও বিবৃতি-সাইদুজ্জামান রওশন
১৬) একাত্তরের ঘাতক দালাল-যা বলেছে যা করেছে - নুরুল ইসলাম সম্পাদিত
১৭) ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাহুল্য নাকি বাস্তবতা- আরিফ রহমান
১৮) গোলাম আজম ও জামায়াতের রাজনীতি- সাপ্তাহিক বিচিত্রা

পত্র পত্রিকায় ধর্মোন্মাদনা

শুরু করছি একটা নাটক দিয়ে।

‘......আজাদ-তারপর কবে যাচ্ছিস?
ফারাবী- কোথায়?
আজাদ- কেন আশফাক তোকে কিছু বলেনি?
ফারাবী- ওহ, আল বদর ট্রেনিংয়ের কথা?
আজাদ- হ্যাঁ, আমরাতো সবাই আগামী দশ তারিখে যাচ্ছি ক্যাম্পে। তুইও যাচ্ছিস তো?

ফারাবী-নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। যাব না কি বলছিস, (একটু থেমে) সত্যি এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ এই দেশের বুকে দাঁড়িয়ে এমন প্রকাশ্যে সশস্ত্র ট্রেনিং লাভের সুযোগ পাচ্ছি দেখে। এতদিন যা ছিল কল্পনা আজ তা বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে-(থেমে) সত্যি তোদের আনন্দ লাগছে না?

আজাদ- কিন্তু এ আনন্দের সাথে মিশে আছে অনেক বেদনা, অনেক কান্নার ইতিহাস। আজ সারা দেশে কত শত শত মানুষকে শুধুমাত্র ইসলাম অনুসারী হবার অপরাধে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে। জীবন্ত খেজুরের কাঁটা বিছানো গর্তে কবর দেওয়া হচ্ছে। গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিকভাবে চোখে, মুখে, বুকে গজাল দিয়ে ঠুকে ঠুকে হত্যা করা হচ্ছে। গরম লোহার শলাকা দিয়ে চোখ উপড়ে দিয়ে বলছে, বল আরো ইসলাম ইসলাম বলবি না কি? শুধু তাই নয়, এদের কেটে টুকরো টুকরো করে ছালায় ভরে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এদের রক্তে পদ্মা-মেঘনার রঙ লালে লাল হয়ে যাচ্ছে

ফারুখ- থাম, থাম আজাদ- থাম্।

আজাদ-এদের দোষ, এদের দোষ এরা চেয়েছিল পাকিস্তানকে একটা সুন্দর দেশরূপে গড়ে তুলবে। এরা চেয়েছিল এখানে আল্লাহর শাশ্বত জীবন বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে। যাতে পাকিস্তানের মানুষ দুবেলা দুমুঠো ভাত, মোটা কাপড়, একটা আশ্রয়, একটু সুখের মুখ দেখতে পায়। সারাদিন মাটির ঘর্মক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পায় কিছু সুখের হাতছানি-

ফারাবী- সেদিন শুনলাম মাওলানা মাদানী সাহেব শহীদ হয়েছেন-

আজাদ- শুধু মাদানী সাহেব কেন, এরকম প্রতিদিন কত শত শত মাদানী অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন, তার খবর রাখিস! গতকাল নোয়াখালী হতে টেলিগ্রাম এলো মাত্র দশ দিনে সেখানে পঞ্চাশ জন ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী শহীদ হয়েছেন (উদ্গত কান্না রোধ করে)- এ'সব ইতিহাস বড় কান্নার ইতিহাস বড় করুণ ইতিহাস-

ফারাবী- আচ্ছা আমরা ক'জন যাচ্ছি তাহলে?

আজাদ- প্রথম ব্যাচে প্রায় শ' দুয়েক- পরে আরো আসতে পারে-

ফারাবী- সত্যি আমার কি যে আনন্দ লাগছে আজ। আগে যখন ইসলামের ইতিহাস পড়তাম- বদর, ওহুদ, খন্দকের যুদ্ধের ইতিহাস পড়তাম, তখন মনে হত, আচ্ছা আমরাও অমন ইসলামী মুজাহিদ হয়ে যুদ্ধের ময়দানে নামতে পারি না কেন? কেন আমরাও আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ পাই না? (একটু থেমে) সত্যি আজ সেই সোনালী সুযোগ এসেছে, সত্যি আজ কি যে আনন্দ লাগছে- কি আনন্দ!

ফারুক- আল বদর, আল বদর।

এই নাটক ৭ নভেম্বর বদর দিবস উপলক্ষে *দৈনিক সংগ্রামের* সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকের নাম ছিল *আলবদর আলবদর আলবদর - ত্রি ওয়ান ত্রি, ত্রি ওয়ান ত্রি , ত্রি ওয়ান ত্রি।*

মূল গল্পঃ

গণহত্যার সাথে সম্পর্কিত খুব পরিচিত একটা শব্দ হচ্ছে Hate Media মিডিয়াকে ব্যবহার করে কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো - যা কিনা গণহত্যায় উস্কানিতে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। এই শব্দ যুগলের সংজ্ঞাটা একটু বড় হলেও তুলে দিচ্ছি বুঝার সুবিধার্থেঃ "Must be defined as directly provoking the perpetrator(s) to commit genocide, whether through speeches shouting or threats uttered in public spaces or at public gatherings or through the sale or dissemination of written materials or printed matter or through public displays of placards or posters or through another means of audiovisual communication." *[উইকিপিডিয়া]*

অর্থাৎ গণহত্যা কিংবা গণহত্যাকারীদের সমর্থনে কিংবা উস্কানিদানের উদ্দেশ্যে জনসভায় বক্তৃতা কিংবা লিফলেট, পোস্টার, প্লেকার্ডে কিংবা লিখিত যে কোন বিবৃতিও Hate Media'র অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু গণহত্যায় উস্কানি দেয়া মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত, সেহেতু Hate media কিংবা এমন প্রোপ্যাগান্ডাও সরাসরি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ (crime against humanity)। একাত্তরে পাকিস্তানি কিংবা পাকিস্তানি সমর্থকদের পত্র পত্রিকাগুলো এই Hate Media'র ই ধারক ও বাহক।

সাধারণত, যে কোন ধরণের মতাদর্শ প্রসারের জন্য কিংবা সে মতাদর্শের মাধ্যমে জনগণের মগজ ধোলাইয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সে মতাদর্শের ব্যাপক প্রচার এবং এখানেই আসে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা। পাকিস্তানি পত্রিকাগুলো কিংবা তাদের দোসরদের পত্রিকাগুলো একাত্তরের পুরো সময়জুড়েই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল; তাদের সীমাহীন প্রোপাগান্ডার কারণে পশিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষরাও ছিলেন অনেকটা অন্ধকারে। পত্রিকাওয়ালারা বুঝিয়েছিল সবাইকে যে এটা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম না, ইহা একটা ধর্মযুদ্ধ।

জনাব আই এ রহমান পাকিস্তানের একজন প্রখ্যাত প্রগতিশীল সাংবাদিক। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহের ভূমিকা কি ছিল? এর উত্তরে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, নেতিবাচক ছিল একাবারে গোড়া থেকেই। যে কয়টি বছর আমরা

একত্রে ছিলাম পাকিস্তানি আদর্শের ও স্বার্থের রক্ষাবরদাররা পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে সব সময় পূর্ব বাংলার নেতিবাচক ছবিই তুলে ধরেছে। ওরা পূর্ব পাকিস্তানের গাত্র বর্ণের কথা তুলত। ... আমাদেরকে একনাগাড়ে বলা হত পূর্ব বাংলার লোকেরা হিন্দু শিক্ষকদের দ্বারা প্রভাবিত...'।

বিগত পর্বগুলোতে আলোচনা করেছি পাকিস্তানিদের মনমানসিকতা এবং তাদের দোসরদের চিন্তাভাবনার গতিপ্রকৃতি। তাদের সেই হিন্দু বিদ্বেষী মানসিকতারই আরেক রূপ খুঁজে পাওয়া যায় তাদের সমর্থিত পত্র পত্রিকায়। আমরা এই পর্বে মূলত বিভিন্ন সংবাদপত্রের দিকে আলোকপাত করব। পাকিস্তান সমর্থিত সংবাদপত্রে প্রধানত যে ধরণের খবর প্রকাশিত হত সেগুলোকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি।

ক) পাক বাহিনীর প্রশংসা ও রাজাকার কর্তৃক বাঙালি নিধনের খবর; যদিও সেখানে বলা হত ভারতের দালাল, দুষ্কৃতিকারী ইত্যাদি;
খ) দালালদের বিবৃতি; অবশ্য এই বিবৃতিগুলোতেও ছিল ধর্মের আবরণ, এবং
গ) হিন্দু তথা হিন্দুস্থানের ষড়যন্ত্র এবং হিন্দু দ্বারা মুসলমান নিধনের খবর সহ হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে কুৎসা রটানো।

শেষের দুই ধরণের খবরেই ধর্মকে ব্যাবহার করা হয়েছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে। দালালদের বিবৃতিগুলোতে ধর্মের ব্যাবহারের ধরণের প্রকটতা ও ব্যাপকতা আগের পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের এমন সাম্প্রদায়িক ও গণহত্যায় উস্কানিমূলক বিবৃতিগুলো যেহেতু প্রচারের জন্যেই পত্রিকাগুলো প্রকাশ করতো এবং এটাকে ইতিবাচক হিসেবেই তুলে ধরত, সেহেতু বিবৃতি প্রদান করে বিবৃতি দানকারী যেমন অপরাধ করেছেন, ঠিক তেমনি এসব প্রকাশ করে একই অপরাধে অপরাধী সেই পত্রিকাগুলোও। প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে দুটো নমুনা উল্লেখ করা যাক।

"দৈনিক পাকিস্তান" এ প্রকাশিত *জমিয়ত নেতার বিবৃতি: পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ জাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি করুন* শিরোনামের খবরে আমরা ধর্ম ব্যাবহারে নিদর্শন স্পষ্ট খুঁজে পাই। খবরে বলা হয়, "পূর্ব পাকিস্তান জমিয়ত ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আলী ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও পাকিস্তানি ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ জাগরণের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ...তিনি বলেন, ভারতের মনে রাখা উচিত যে পাকিস্তান আল্লাহতালার মহান সৃষ্টি এবং আমাদের শত্রুদের কোন অসৎ অভিসন্ধিই আল্লাহর ইচ্ছায় অংকুরে বিনষ্ট হবে"।

পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের সভাপতি মৌলভী ফরিদ আহমদ করাচিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সদস্যদের বিচার দাবী করেন। তার সে সম্মেলনের পুরো খবরই দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশ করে "আওয়ামী লীগ সদস্যদের প্রকাশ্য বিচার দাবী" শিরোনামে। এখানে তারা উল্লেখ করে, "মৌলভী ফরিদ আহমদ মনে করেন যে পুর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় সমস্ত মুসলিম বিশ্বের চোখ খুলে যাওয়া ও ইসলামের গৌরবের জন্য ঘনিষ্ঠতর ঐক্যের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত"


করাচীতে ফরিদ আহমদের সাংবাদিক সম্মেলন

আওয়ামী লীগ সদস্যদের প্রকাশ্য বিচার দাবী

দুটো খবরেই দেখবেন, আমরা দেখতে পাই সেই পুরোনো সমীকরণের অস্তিত্ব: পাকিস্তান = মুসলমান, ভারত = হিন্দু! মৌলভী ফরিদ আহমদ এর এমন অনেক বিবৃতিই তখনকার পাকিস্তানপন্থি পত্রিকাগুলো প্রকাশ করতো। যেমন ১৬ এপ্রিল তার বিবৃতি প্রকাশ করা হয় "ভারত মুসলমানদেরকে হিন্দু ব্রাক্ষ্মণ্যবাদীদের গোলাম বানাতে চাচ্ছে" শিরোনামে। এমন ধর্মীয় উত্তেজনা মিশ্রিত বিবৃতিগুলো তখন নিয়মিতই প্রচার করত পত্রিকাগুলো।

এবার দেখব তৃতীয় ধরণের খবর এবং এখানে মূলত নজর দেয়ার চেষ্টা করব সম্পাদকীয়গুলোর দিকে কিংবা ঐ সময়ে প্রকাশিত আর্টিকেলের দিকে। আমার হাতে ছিল মাত্র দুটো পত্রিকা *দৈনিক সংগ্রাম* ও *দৈনিক পূর্বদেশ*; তন্মধ্যে পূর্বদেশ–এর ডিসেম্বরের মাত্র দশটা পত্রিকা। এতেই অবশ্য আমরা যা পাই তাতেই শিউরে উঠি।

যুদ্ধের আগেই প্রোপাগান্ডার জন্যে '*আইএসআই*'র অর্থায়নের পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল *দৈনিক সংগ্রাম*। পুরো একাত্তর জুড়েই সম্পাদক আখতার ফারুকের এই পত্রিকাটা বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রোপাগান্ডা চালায় এবং গণহত্যার উস্কানিতে রেখেছিল শক্তিশালী ভূমিকা। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির প্রমাণ উল্লিখিত নাটকটা প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকাটাতেই। এখানে উল্লেখ্য, *সংগ্রাম* এর প্রতি

খবরেই হিন্দু ও ভারত আসলে সমার্থক হিসেবেই তুলে ধরা হত; যেখানে হিন্দুস্থানের ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে সেখানে আসলে হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছিল। এ ধরণের খবরের প্রধান টার্গেট ছিল মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা; তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করে এবং তাদের দ্বারা যে মুসলমানদের ক্ষতি হচ্ছে, যেমন, "মুসলমানদের দাড়ি জোর করে কেটে দিচ্ছে"(১৭ জুন) এমন উত্তেজনাকর খবর প্রকাশ করে দুই ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করাই ছিল প্রধান লক্ষ। আগেই বলেছিলাম, ৭১ এর আগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রচারণার "ইসলামীকরণ" শুরু করেছিল; ৭১ এসে সেই প্রচারনা সবচেয়ে বেশী কাজে লাগিয়েছিল দৈনিক সংগ্রাম। এই পত্রিকায় হিন্দুয়ানী ভীতি সংক্রান্ত খবরের পরিমাণ এতই বেশী যে, শুধু এটা দিয়েই একটা বই রচনা করে ফেলা যায়। আসলে তাদের প্রতিদিনকার প্রতিটা খবরেই কোন না কোনভাবে ধর্মকে টেনে এনেছে, ধর্মকে দাড় করিয়েছে স্বাধীনতার সম্মুখে, মুখোমুখি করেছে হিন্দু মুসলমানকে। এমন অসংখ্য খবরের মধ্যে মাত্র কয়টার উল্লেখ নিচে দেয়া আছে; এতেই বোঝা যাবে ধর্ম ব্যবহারে তাদের তীব্রতা ও ব্যাপকতার মাত্রা।

"রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি হিন্দু...... গত কয়েক সপ্তাহ আগে জিন্নাহ হল যখন সূর্যসেন হলে পরিণত হলো এবং রবীন্দ্রনাথের গান জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রস্তাবিত হলো তখন ভারতের হিন্দুরা তাদের সাফল্যে আনন্দে ডুগডুগি বাজাতে শুরু করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে যখন আশা ভঙ্গ হলো এবং তাদের আশার প্রদীপটি নিভে গেল তখন ভারতীয় হিন্দুদের স্বভাবতই বেসামাল হয়ে পড়ার কথা।"(*১০ এপ্রিল, শিরোনামঃ ভারতের মায়াকান্না*) এখানে আশাভঙ্গ মানে ২৫ মার্চ রাতের অপারেশন সার্চলাইট এর কথাই বোঝানো হচ্ছে।

"আমরা গত ১ লা মার্চ থেকে থেকে তাদের তথাকথিত জয়বাংলার স্বেচ্ছাচার দেখেছি, তাদের লুঠতরাজ ও হত্যা অপহরণ আমাদের অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছে। দেখেছে তাদের অমুসলিমদের সহযোগিতায় পাইকারি হারে মুসলমানের গলাকাটার লীলা" (*১৫ এপ্রিল, শিরোনাম: জনতা পাকিস্তান চায়*)

"আল্লাহর লাখো শুকরিয়া যে, মাননীয় প্রেসিডেন্ট যথাসময়ে হস্তক্ষেপেও লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় আরেকবার আল্লাহর দান পাকিস্তান শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে"। (*২২ এপ্রিল, শিরোনামঃ জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি*)

"এ সমাজ বিরোধীদের দমনে সরকারকে সাহায্য করা একদিকে নিজেকে সাহায্য করা ও অপরদিকে নিজের ইমানী দায়িত্ব পালন করার সামিল"। (*৪ মে, শিরোনামঃ দুষ্কৃতিকারীদের ধরিয়ে দিন*)

এই সমাজ বিরোধীরা হচ্ছে স্বাধীনতাকামী বাঙালিরা এবং এদের ধরিয়ে দিলে ইমানী দায়িত্ব পালন করা হবে। তার মানে, যারাই স্বাধীন বাংলা চেয়েছিল তাদের সকলের ইমান চলে গিয়েছিল!

"তাই দুনিয়ার সেরা মুসলিম রাষ্ট্রের ধ্বংসকামী বাংলাদেশ ওয়ালারা জাতির ইতিহাসে মীরজাফর পরিভাষারই নতুন সংস্করণ হয়ে দেখা দেবে"। (৬ *মে, শিরোনামঃ তিক্ত হলেও সত্য*)

"জনাব তাজউদ্দীন পাকিস্তানকে অস্বীকার করে ভারতের নাগরিত্ব গ্রহণের সাথে সাথে তিনি স্বভাবতই শ্রী তাজউদ্দীন হয়ে গেছেন"। (৮ *মে, শিরোনাম: শ্রী তাজউদ্দীনের বাংলাদেশ"*)

"মুসলমানী ভাবধারা পুষ্ট জাতীয় সংগীতের স্থান দখল করেছিল মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু কবির রচিত গান'। (১২ *মে, শিরোনামঃ সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের ইতি হোক*)

'এ নতুন জাতির নাম হলো জয় বাংলা জাত। তাদের কলেমা ও সালাম কালাম হলো "জয় বাংলা", তাদের দেশের নাম বাংলাদেশ, তাদের ধর্মের নাম বাঙালি ধর্ম। এ ধর্মের প্রবর্তকের নাম দিয়েছে তারা বঙ্গবন্ধু'। (১৩ *মে, শিরোনাম: জয় বাংলা ধর্মমত*)

২০ তারিখ *গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী* শিরোনামের এক সম্পাদকীয়তে সরাসরি শান্তিকমিটির লোকদেরকে ইসলামী বানিয়ে দেয়া হয়। "কোন কোন এলালায় গভীর রাত্রে এসে দুষ্কৃতিকারীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি করে। আর শান্তি কমিটি তথা ইসলাম ও পাকিস্তানবাদী লোকরাই বিশেষভাবে তাদের শিকারে পরিণত হয়েছে বলে জানা যায়"। তার মানে, পাকিস্তানবাদী লোকেরাই একমাত্র মুসলমান ছিল আর কেউ মুসলমান ছিল না তখন।

৬ মে শরণার্থী বাহানা শিরোনামের খবরে বলা হয়, ভারতে কোন শরণার্থী যায়নি; অথচ, ৩ জুন খবরে বলা হয়: "ভারত এ নীতি নিয়েছে যে হিন্দু হলে শরণার্থী এবং মুসলমান হলে অনুপ্রবেশকারী। খাবার ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানের বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি কোন কোন শিবিরে মুসলমান যুবকদের আলাদা করে গুলি করে হত্যা করার মত ঘটনা ঘটেছে"। এখানেও হিন্দু - মুসলিম উত্তেজনা ছড়ানোর অপচেষ্টা!

আবার, আরেকদিন লেখা হয়, "যারা আল্লাহু আকবর ছেড়ে জয় বাংলা ধ্বনি তোলে, সালাম কালাম ভুলে জয় বাংলা জিগির চালায়, শহীদ মিনারে চন্ডী দেবী পূজা করে, বর্ষবরণে যুবক যুবতীরা মিলে সূর্যদেব ও প্রকৃতি দেবীর অর্চনার নামে কেলী চালায়, হিন্দুর প্রেমে যারা বাঙালি ও বাঙালি মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ চালায়,

ভারতের প্রেমে পাকিস্তানের বুকে ছুরি হানে তারা মীর জাফর হলো না, মীর জাফর হলো ইসলাম ও পাকিস্তানের পতাকাবাহীরা"। (*৯ জুন, শিরোনামঃ মীর জাফর কারা*) শহীদ মিনারে কিংবা বর্ষবরণে বাঙালি যে হিন্দু দেব দেবীদের পূজা করত সেটা জানা ছিল না! "বাঙালি মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ" কারা সম্পন্ন করেছিল সেটা সবাই জানি। কিন্তু এখানে আবারো হিন্দুরা মুসলমান হত্যা করছে বলে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৫ জুন *আলেমদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রচারণা* শিরোনামের খবরে অভিযোগ তোলা হয় যে, হিন্দুরা আলেমদেরকে হত্যা করে ইসলামকে বিপণ্ন করে তুলছে। উল্লেখ্য, প্রকৃতপক্ষে, এই আলেমরা হচ্ছেন পাকিস্তানি দালাল রাকাজার, আলবদররা নিজ কার্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত লম্বা দাড়ি সহ টুপি-আলখাল্লাহ পরিহিত ধর্মব্যবসায়ীরা। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "মুসলমানদের জাত শত্রু ইহুদিরা আরব মুসলমানদের যেভাবে ব্যতিব্যস্থ করে তুলেছে তেমনি ইহুদিদের পরম বন্ধু হিন্দুরাও একই যোগসাজশে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলোপের কাজ করে যাচ্ছে। হিন্দুরা এ দেশ থেকে ইসলাম খতম করার জন্য আলেমদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছে এ অভিযানকে প্রতিহত করতে হলে শুধু সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়ে থাকলেই চলবে না, সামরিক কর্তৃপক্ষের থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ও ইসলামের জন্য উপযোগী পন্থা বেছে নিতে হবে"। [*১৫ জুন*]

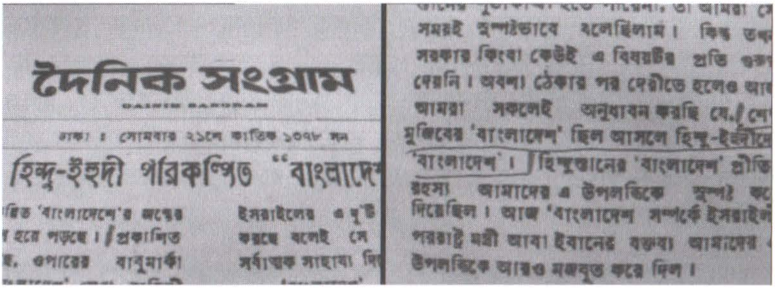
"শত শত বাংলাভাষী আলেম ও ওলামা ও দাড়ি টুপিওয়ালাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী হোতাদের আসল রূপ আজ ধরা পড়েছে" (*৪ আগস্ট, শিরোনাম: দালালদের স্বরূপ*)

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালানোর সময় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হন পাকিস্তানি দালাল মাওলানা (!) মাদানী, তার জন্যে নিজামী, গোলাম আযমদের কান্নার খবর আগের পর্বেই উল্লেখ করেছি। তাকে শহীদ উপাধি দেয়া হয়। ১০ সেপ্টেম্বর *সংগ্রাম* এ *শহীদ মাদানী দিবস* শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এতে আওয়ামীলীগকে হিন্দুদের পদলেহী আখ্যায়িত করে বলা হয়, "শহিদ মাদানী এবং পূর্ব পাকিস্তানের জানা অজানা শহিদরা তাদের জীবন কোরবানি দিয়ে আমাদের এক কথাই বলে গেছেন এবং বলে যাচ্ছেন হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের জাতিদ্রোহী চক্র এ দেশ থেকে মুসলমানদের উৎখাত করে হিন্দুদের বহুকাল লালিত জঘন্য মতলবকে বাস্তবায়িত করতে চায়"।

"মুক্তিবাহিনী আসলে একটি হিন্দু বাহিনী" (*৯ অক্টোবর*)

"তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর শতকরা ৯০ জনই এখন হিন্দু এবং তাদের চালাচ্ছে ভারতীয় আর্মি ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অফিসাররা"। (*১৩ অক্টোবর, শিরোনাম: শরণার্থী কি কেউ ফেরেনি*)

"শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ছিল আসলে হিন্দু ইহুদিদের বাংলাদেশ"। (*৮ নভেম্বর, শিরোনাম: হিন্দু ইহুদি পরিকল্পিত বাংলাদেশ*)



দৈনিক সংগ্রাম

ঢাকা : সোমবার ২১শে কার্তিক ১৩৭৮ সন

হিন্দু-ইহুদী পরিকল্পিত "বাংলাদে

সময়েই সুস্পষ্টভাবে বলেছিলাম। কিন্তু
সরকার কিংবা কেউই এ বিষয়টির প্রতি
দেয়নি। অবশ্য ঠেকার পর দেরীতে হলেও
আমরা সকলেই অনুধাবন করছি যে
মুজিবের 'বাংলাদেশ' ছিল আসলে হিন্দু-
'বাংলাদেশ'। হিন্দুস্তানের 'বাংলাদেশ' প্রীতি
রহস্য আমাদের এ উপলব্ধিকে
দিয়েছিল। আজ 'বাংলাদেশ' সম্পর্কে ইসরাইল
পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবা ইবানের বক্তব্য আমাদের
উপলব্ধিকে আরও মজবুত করে দিল।

নভেম্বরের ১৪ তারিখ *সংগ্রাম* এ প্রকাশিত হয় *আলবদর* নামক প্রবন্ধটি; উল্লেখ্য, বর্তমানে চলাকালীন যুদ্ধাপরাধীদের রায়ে এই প্রবন্ধটা ছিল আলবদরের কর্মকাণ্ডের খুব বড় দলিল। প্রবন্ধটি শুরুতেই বলা হয়: 'আলবদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী, আলবদর সেখানেই। যেখানে দুষ্কৃতিকারী আলবদর সেখানেই'। তারপর আলবদরের যাবতীয় ফিরিস্তি দেয়া আছে প্রবন্ধজুড়ে, কিভাবে কার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, কেন শুরু হয়েছিল, পরবর্তীতে কি কি সফলতা অর্জন করেছিল, কোথায় ট্রেনিং দেয়া হয় ইত্যাদি। আলবদরের প্রতি মানুষের মুগ্ধতার কথা বলতে গিয়ে লেখা হয়েছে,। "পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও ইসলামের হেফাজতে আলবদরের বলিষ্ঠ ভূমিকা ভারতীয় চর, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের সমূলে উৎখাত করে জনজীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার কার্যাবলী ও ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ জনসাধারণকে শুধু মুগ্ধই করেনি, বরং তাহাদেরকে চির কৃতজ্ঞতাবোধে আবদ্ধ করেছে। জনজীবনে আলবদর তাই সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতীক"।

সহজ ভাষায় দাঁড়ায়, তাদের কাছে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও ইসলামের হেফাজত একই জিনিস। এই অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে কিংবা ইসলামের হেফাজত করতে গিয়ে তারা যা করেছে তার একটি ছোটখাটো উদাহরণ দেব এবার। আব্দুল বারী নামক এক আল বদর সদস্যের ব্যাক্তিগত ডায়রিতে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়; এর মধ্যে কয়টি হচ্ছে: 'টাঙ্গাইলে Successful Operation হয়েছে। হাজার দেড়েকের মতো মুক্তিফৌজ মারা পড়েছে আলবদর ও আর্মিদের হাতে'

২৬-১০-৭১ Prostitution Quarter
২৪ -১০-৭১ Raping Case...... Hindu Girl'

বিবরণগুলোতে স্পষ্টভাবে বেশ্যালয়ে গমন ও হিন্দু নারী ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়। এই কাজগুলো তারা রুটিনমাফিক করতো, আবার মুখে বলতো যে ইসলাম হেফাজতের কথা।

এটাই শেষ না, কিছু নমুনা মাত্র। আগ্রহী পাঠকরা আলি আকবর টাবীর "মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা" নামক বইটা পড়লে সবকিছু পেয়ে যাবেন। লেখক মূলত এই বইয়ে সংগ্রামে প্রকাশিত খবরগুলো তারিখ অনুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন, যদিও সব জোগাড় করা সম্ভব হয় নাই। শুরুতেই *সংগ্রামে* প্রকাশিত একটা নাটকের কথা উল্লেখ করেছি, এবার দেখব তাদের একটা রম্য রচনা। প্রকাশিত হয়েছিল ৮ এপ্রিল; শিরোনাম ছিল *নিজেরে হারায়ে খুঁজি*।

"নয়াদিল্লী, মিসেস গান্ধী তার নিভৃত ড্রয়িং রুমে ইজি চেয়ারে বসে আছেন। সামনে বিরাট একটি মানচিত্র। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রকে হলুদ রেখায় ঘিরে রাখা হয়েছে। হলুদ রেখার ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে প্রথম শিকার। মিসেস গান্ধী এক দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পদ্মা যমুনা মেঘনা প্রভৃতি নদী বিধৌত শস্য শ্যামলা পূর্ব পাকিস্তানের কথা মনে পড়তেই তার চোখ দুটি লোভে চিক চিক করে ওঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, একে ফজলুল হক প্রমুখ পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোধাদের বিরুদ্ধে তার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল। এরাই তো মুসলমানদের চোখ খুলে দিল আর তার ফলেই তো ভারত মাতার দেহ দিখণ্ডিত হলো। মিসেস গান্ধী আঁচলে গলা জড়িয়ে করজোড়ে স্বগতঃ কণ্ঠে বলল, মা তোমার রক্তাক্ত দেহের কথা আমরা ভুলিনি তোমার কান্না আমরা শুনতে পাচ্ছি মা। পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই আমরা তোমার মহান শিবাজীর স্বপ্নের রামরাজ্য গড়তে পারব"।

মূল গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়

'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকার ভূমিকা ছিল পুরো বৈপরিত্যমূলক; একাত্তরের নয় মাস ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, এবং পাকিস্তানের দালালি করেছে সাধ্যমত। বিজয়ের পরপরই ডিগবাজি খেয়ে রীতিমতো সাইড পাল্টে ফেলে এই পত্রিকা। জানুয়ারিতে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোতে দেখা যায় পাক বাহিনীর ধ্বংসলীলার এবং গণহত্যার চিত্র ফুটে উঠতে। কিন্তু আমরা দৃষ্টি দেব একাত্তরের ঐ নয় মাসের খবরের দিকে। আপাতত, শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসের কয়টা পত্রিকা যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে।

ডিসেম্বরের ১ তারিখে *দৈনিক পূর্বদেশ* এ *হিন্দু মানসিকতার স্বরূপ* নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; লেখক বৈরাম খা। লেখক সেখানে অনেক খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন হিন্দু ধর্ম কি এবং কেন তারা খারাপ। তার মতে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে সাম্য ও ঐক্যের কোন নামগন্ধও নাই। "হিন্দু বর্ণবাদ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, সাম্য

এবং গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুসলমানদের ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সামান্যতম মিলও নেই। এই ধর্ম, বিশ্বাস হাজার হাজার বছর ধরে এমন এক জাতিভেদ প্রথার লালন পালন করে আসছে যা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিভেদের অস্বাভাবিক দেয়াল আর তা মুসলমান, খৃষ্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পরিণত করতে চায় ভূমি দাসে"।

প্রবন্ধের শেষের দিকে এসে তিনি কিছু প্রশ্ন করেছেন এবং সেখানে সরাসরি ইঙ্গিত দিয়েছেন হিন্দুদের সাথে একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়। সে সময়ে এই লেখা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে, এটা নিশ্চিত। শেষের লাইনগুলো যে কারণেই হোক বাঙালি নিধনের বৈধতা দানের একটা অপচেষ্টা মাত্র। তার প্রশ্নগুলো তুলে দিচ্ছি সরাসরি, "হিন্দু কে? হিন্দু ধর্ম কি? তার বৈশিষ্ট্যই বা কি যাকে আমরা ঘৃণা করি? তাদের সাথে অন্য কারো একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয় কেন? এর কারণ কি অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা, না জীবনের বাস্তব সত্য? অন্য আরেকদিন আমরা এক প্রশ্নগুলর উত্তর দেবার চেষ্টা করব।"



হিন্দু মানসিকতার স্বরূপ

বৈরাম খাঁ

'Of all forms of fraudulent practice political chicanery is the most disgusting why should the kerala muslims want a district all to themselves unless they wish to band together some reason or other? It may be argued that unlike the congress partitioning the country this Kerala district will remain in the Indian dominion. Then why have a separate district for Muslims? Is not the Principle behind its formation the same as behind partition?'

"Hindu caste system which is a direct negation of nationalism, equality, democracy... Muslims are the adherents of a faith which stands in sharp contrast to the exclusive nature of Hindu Dharam philosophy which has fostered and maintained for thousands of years a rigid caste system resulting in the creation of unnatural barriers between man and man and which threatens to reduce Muslims Christian and other minorities to the status of irredeemable helots, socially and economically."

"The real creators of the demands for Pakistan were the (Hindu) Congress High Command. If they had been prepared to abate their claims to be the sole spokesman for India and had tried to allay Muslim fears slightly Pakistan might never have come to birth."

২ তারিখ *প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব* শিরোনামে সম্পাদকীয়তে এ দেশের যুব সমাজ হিন্দুর গোলামি কখনো করবে না উল্লেখ করে বলা হয় যে, "আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহর দান এই পাকিস্তানকে ধ্বংস করার শক্তি দুনিয়াতে কারো নেই আমরা শত্রুর যুদ্ধ সাধ মিটিয়ে দেব"। পুরো নিবন্ধ জুড়ে হিন্দুস্থানের ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এখানেও

পাকিস্তানকে আলাহর দান বলে ধর্মকে আবারো হাজির করা হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপরীতে।


পূর্ব্বদেশ

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব

৩ ডিসেম্বর *হিন্দুস্থানে রুশ সমরসম্ভার* শিরোনামের সম্পাদকীয়তে হিন্দুস্থানের ষড়যন্ত্রের সাথে কিভাবে সমাজতন্ত্রী রাশিয়াও জড়িত তা আলোচনা করা হয়েছে। আশার বাণী শুনিয়ে অবশ্য এটাও বলা হয়েছে, এতে ভয়ের কোন কারণ নেই কেননা পাকিস্তানিরাও সৌদি আরব, ইরান, জর্ডান প্রভৃতি দেশসমূহ থেকে প্রচুর অস্ত্র পাচ্ছে। শেষ দিকে পাকিস্তানিদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, "পাকিস্তানিদের হতাশ ও নিরুৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। তাদের জানা উচিত আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও দুনিয়ার বুকে মুসলমানদের ইজ্জত রক্ষার সংগ্রাম"। ত্রিশ লক্ষ বাঙালি [মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল] হত্যা, হত্যা করার সময় চিড়িয়া মিল গেয়া বলে চিৎকার করা, চার লক্ষ বোনকে [মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল] ধর্ষণ করা, ধর্ষণ শেষে স্তন কেটে ফেলা এসব তাহলে ছিল মুসলমানদের ইজ্জত রক্ষার সংগ্রাম'?


পূর্ব্বদেশ

হিন্দুস্থানে রুশ সমরসম্ভার

ঐ দিনই জেড এ সুলেরী লিখিত *একটি মাত্র সমস্যা* শিরোনামে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার মতে পাকিস্তান ও ইসলাম একই সূত্রে গাঁথা, অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেখানে যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়েছে কেন হিন্দুস্থান ও রাশিয়ার সাথে আমাদের, মানে মুসলমানের এত সমস্যা এবং এহেন অবস্থায় মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কেও বলা হয়েছে, অর্থাৎ জেহাদের ডাক দেয়া হয়েছে।

'বর্তমান সংকটের গুরুত্ব আরেকবার এই ঐতিহাসিক সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে যে, ৪০ এর দশকে আমরা যে কারণে হিন্দুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম আজকেও সেই একই কারণ আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সে সময় প্রশ্ন ছিল মুসলিমদের পৃথক জাতীয় সত্ত্বার অধিকার আছে কিনা, ধর্ম এর অনুসারীদের জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে পারে কি না? ...একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার সমস্যা হলো ইসলাম। ...মুসলমানদের সাথে খৃষ্টান ও ইহুদিদের মতবিরোধ থাকলেও এই দুই ধর্মের অনুসারীদের সাথে ইসলামের বিরোধ হিন্দু ধর্মের মতো তীব্র নয়। ...কাজেই ইসলাম ও পাকিস্তান অবিচ্ছেদ্য। ইসলাম ছাড়া পাকিস্তান অর্থহীন। সর্বোপরি ইসলামকে ছেড়ে দিলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকে না। ...বর্তমানে ভারত যে আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে সে জন্যেই আমরা ইসলামকে কিছুতেই ছাড়তে পারি না। যারা ইসলামের জন্য জেহাদ করতে প্রস্তুত তারাই পাকিস্তানের জন্য লড়াই করার উপযুক্ত।'


একটি মাত্র সমস্যা

জেড, এ, সুলেরী

'ইসলাম ও পাকিস্তান অবিচ্ছেদ্য'- ইসলাম ও পাকিস্তানকে এক করে ফেলার এই বাক্যটা বোধহয় তখনকার ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রচলিত বাক্যগুলোর একটি।

৫ ডিসেম্বরের *ন্যায়ের সংগ্রামে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত* শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'সংকটকালে মুসলমানদের ইমানের পরীক্ষা হয়। এ

পরীক্ষায় তারা কোনদিন ব্যর্থকাম হয় নি। যাদের শিরা উপশিরা কলেমা তাইয়েবার রক্ত প্রবাহিত, জেহাদের ময়দানকে তারা আমন্ত্রণ জানায়, শত্রুর রক্ত ফিয়ে তারা অজু করে। পাকিস্তানের বারো কোটি মুসলমান ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবে। শত্রুর মৃত লাশ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে তারা প্রমাণ করবে যে, মুসলমান কোনও দিন পরাজিত হয় নি, তারা চির দুর্জয়'। এটা স্পষ্ট, যথারীতি ১৯৭১ কে ইসলাম রক্ষার আন্দোলন বানিয়ে জেহাদেরই ডাক দেয়া হচ্ছে।


পূর্ব্বদেশ

ন্যায়ের সংগ্রামে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত

৭ ডিসেম্বর সত্তরের নির্বাচনকে নিয়ে *পূর্বদেশ* -এ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, শিরোনাম: *আজ সাতই ডিসেম্বরঃ নির্বাচনোত্তর একটি বছরের স্মরণিকা*। এখানে লেখক শুরুতেই "ইতিহাস" নিয়ে বিরাট এক কপচানো দিয়েছেন, ইতিহাস কি, কেন আমাদের ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন, বিখ্যাতজনেরা ইতিহাস চর্চা নিয়ে কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকক্ষণ পরে তিনি আসেন মূল বিষয়ে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গে। ৭০ এর এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সময় তার মনে হয়েছে "কখনো কখনো অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভুলে গিয়ে বর্তমানকে নিয়েই ব্যপৃত থাকতে হয়"।

ইতিহাস ছেড়ে বর্তমান, মানে ১৯৭১ এ ফিরে আসতে চাইলে তার মনে পড়ে যায় বিষাদ সিন্ধুর কারবালার কথা, ইমাম হাসান হোসেইনের কথা। কারবালার সেই বিষাদময় ঘটনার সাথে অতঃপর তুলনা করে তিনি বলেন, "তেমনি একটি চরম দূর্যোগ মূহুর্ত আজ আমাদের সামনে..."। আত তারিখ ইবনে মাজ্ঞি, এই প্রবন্ধের লেখক খুব সুচারুভাবে বিজ্ঞজনের মতো চমৎকার কৌশলে ধর্মকে টেনে এনে একাত্তরের সংগ্রামের সামনে মুখোমুখি দাড় করিয়েছেন।

৮ ডিসেম্বর *সীমান্ত এলাকায় হিন্দুদের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম* শিরোনামের খবরে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সমূহে পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা আবারো ফিরে

আসতে শুরু করেছে। তথাকথিত (!) মুক্তিবাহিনীর এই লোকেরা মুসলমানদের মসজিদে হামলা করছে এবং মুসলমান নারীদেরকে তারা ধর্ষণও করছে।

একই পাতায় ভারত সব সময় পররাজ্য দখলের বিকৃত চিন্তা করে আসছে শিরোনামে আরেকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভারতের এই বিকৃত চিন্তার কথা লিখতে গিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে হিন্দু ধর্মকে, হিন্দুদের দেবতাদের প্রসঙ্গ। "তথাকথিত শক্তিশালী ভগবানেরা কেমন ভাবে তাদের দেবত্বের দ্বারা অন্যান্যকে প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করত, তার বহু দৃষ্টান্তে হিন্দু পুরান পূর্ণ রয়েছে। এটা শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও এক শ্রেণির হিন্দুরা অন্যান্য শ্রেণির দ্বারা বঞ্চিত হতো"। হিন্দুস্থান কিভাবে শুধু দখলের চেষ্টায় মত্ত থাকে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া শেষ হওয়ার পর এই আশাবাদও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মুসলমানের আবাসভূমি পাকিস্তানকে যে কোনভাবেই এই হিন্দুদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। "মুসলমানদের আবাসভূমি এই পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য কোন ত্যাগ ও উৎসর্গই অধিক বিবেচিত হবে না"।



সীমান্ত এলাকায় হিন্দুদের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম

ঢাকা ৬ই ডিসেম্বর (এপিপি)।— পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকা সমূহে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা আবার তাদের অসল রূপে ফিরে আসতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের সার্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী উক্ত এলাকা থেকে লোকজনদের সরিয়ে নিয়েছিল বলে প্রকাশ।

উক্ত এলাকা থেকে গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে এপিপির [illegible] সংবাদদাতা জনাব অলতাফ [illegible] বলেন যে, তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর অসৎ চরিত্র ও সমাজবিরোধী লোকজন মসজিদে হামলা করে ও সীমান্তের নিরীহ জনগণের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছে।

তারা স্থানীয় লোকজনের নিকট থেকে অর্থ আদায় করছে এবং যদি কেউ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাকে বেদম প্রহার করা হতে থাকে। যদি তারা কেউ জানান যে, তাদের নিকট কোন রকম টাকাপয়সা নাই তবে তাদের নিকট থেকে দ্রব্য সামগ্রী যেমন অলঙ্কার, মূল্যবান কাপড় চোপড়, চিনি বা অন্য কোন খাদ্যজাত দ্রব্যাদি চাওয়া হয়। নিরীহ লোকজন কিছু প্রদান করতে দ্বিধা প্রদর্শন করলে বা সামান্য কিছু দিলে গুণ্ডারা তাদের জিনিসপত্র লুট করে তাদের পৈশাচিক আকাঙ্ক্ষা

শেষের গল্প

এধরণের খবরগুলো তখন সরাসরি উস্কানি দিতো গণহত্যায়; পাপের বৈধতা দানের চেষ্টা বরাবরই বাড়িয়ে দেয় সে পাপের প্রবণতা। তারা মাঠে নেমেছিল একটা লক্ষ্যকে ঠিক করেই, কিভাবে বাঙালি নিধনে উৎসাহ দেয়া যায় এবং নিধনের পরবর্তীতে কিভাবে বৈধতা দেয়া যায়। গণহত্যায় উত্তেজনা তৈরিতে তারা বেশ সফলও ছিল। এর একটা নমুনা দেয়া যাক। ১২ নভেম্বর *রোকেয়া হলের ঘটনা* শিরোনামে একটা সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রাম -এ। এতে সরাসরি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার উপদেশ দেয়া হয়।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর থেকে যারা এ দুষ্কর্মচক্রে সহায়তা করছে তাদেরকে যদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় তবে সেটাই সঠিক পদক্ষেপ হবে বলে আমরা মনে করি। আর এর দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্টান ও অফিস থেকেও সকল ছদ্মবেশী দুষ্কৃতিকারীদের উৎখাত করতে হবে। আমরা বহুবার এ কথা বলেছি যে, আমাদের অভ্যন্তর থেকে ছদ্মবেশী দুষ্কৃতিকারীদের উচ্ছেদ করার মাধ্যমেই শুধু আমরা হিন্দুস্থানি চরদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিতে পারি"।

এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১২ নভেম্বর, মাত্র এক মাস পরই রায়ের বাজারে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়।

১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় গণহত্যায় Radio Télév ision Libre des Mille Collines [RTML] ভূমিকা ছিল প্রবল নেতিবাচক। RTML তুতসীদের মারার জন্য শুধু উৎসাহ কিংবা আদেশই দিত না বরং তুতসীদের মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করাটাও প্রতিটা নাগরিকের দায়িত্ব বলেও প্রচার করত; all citizens to see killing Tutsi as their responsibility। শুরুতেই hate media সম্পর্কে বলেছিলাম, নুরেমবার্গ ট্রায়ালের পর থেকে এটাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবেই দেখা হয়; Crime against humanity। এই অভিযোগে RTML এর দুই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য Ferdinand Nahimana এবং Jean-Bosco Barayagwiza কে International Criminal Tribunal for Rwanda [ICTR] যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় Der Stürmer ইহুদিদের বিরুদ্ধে চালিয়েছিল ভয়ংকর অপপ্রচার। খবর, ছবি, বিজ্ঞাপন ও কার্টুনের সাহায্যে এই পত্রিকা যেমন ইহুদি নিধনের উত্তেজনা ছড়াত, তেমনি বহন করত নাৎসি প্রোপ্যাগান্ডা। এ কাজের জন্যে পত্রিকাটির তৎকালীন সম্পাদক Julius Streicher কে নুরেমবার্গ ট্রায়াল ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশ সবসময় উল্টো রথের যাত্রী। উপরোক্ত ভয়ংকর কর্ম সম্পাদনের পরও দৈনিক সংগ্রাম বহাল তবিয়তে বাংলাদেশে আছে। এর তৎকালীন সম্পাদক আখতার ফারুককে কোন শাস্তির সম্মুখেও দাঁড়াতে হয় নি, বরং বুক ফুলিয়েই হেঁটেছিল বাংলার পথে প্রান্তরে।

শুরুতেই উল্লেখিত নাটকটাই প্রমান করে, ধর্মকে ব্যবহার করে তরুণদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে কি ভয়ংকরভাবে হিন্দু-মুসলিম কে মুখোমুখি করার প্রয়াস নিয়েছিল তারা। এই ধারাটা আমাদের এখনো বহাল। রাজাকার সাইদিকে বাঁচাতে কাবা শরীফের গিলাফ পরিবর্তনের ছবি দিয়ে বলা হয়েছিল এটা নাকি সাইদির জন্যে বিশ্ব ইমামদের জায়নামাজ ছুঁয়ে শপথ গ্রহণের ছবি! সাইদিকে চাঁদে নিয়ে যাওয়ার মত প্রোপ্যাগান্ডাও এখানে ছড়ানো হয়েছিল! দালালদের পত্রিকাগুলো তাদের পুরোনো অভ্যাস ধরে রেখেছে। *দৈনিক সংগ্রাম* এখনো স্বাধীনতা বিরোধিদের পক্ষে কথা

বলে; প্রতিটা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পর স্বমহিমায় তাদেরকে শহীদ খেতাব দেয়ার গুরুদায়িত্ব নেয় এই পত্রিকা। *দৈনিক সংগ্রাম* স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করবে এটা স্বাভাবিক, তাদের কাছে এর পরিবর্তে আর কিছু আমরা আশাও করতে পারি না; তবে অস্বাভাবিক বিষয়টা হচ্ছে এখনো এই বাংলায় তাদের টিকে থাকাটা, তখনো আমাদের বিরুদ্ধে ছিল, এখনো আছে। রাজাকার মাওলানা (!) মান্নানের দৈনিক ইনকিলাব হয়ে ওঠে পরবর্তীতে আরেক একাত্তরের চেতনা বিরোধী পত্রিকা। এই "পত্রিকা গোষ্ঠি" ধর্মকে ব্যাবহার করে অনবরত মগজ ধোলাই দিয়ে যাচ্ছে সবাইকে; তাদের ধোলাইকৃত মগজের এক বিকৃত প্রজন্ম আমরা দেখতে পাই আমাদের চারপাশে নিত্যদিন।

তথ্যসূত্রঃ

১) দৈনিক পূর্বদেশ [কৃতজ্ঞতায়ঃ আরিফ রহমান]

২) দৈনিক পাকিস্তান [কৃতজ্ঞতায়ঃ সাব্বির হোসাইন]

৩) Wikipedia

৪) মুক্তিযুদ্ধের দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা- আলী আকবর টাবী

৫)একাত্তরের দালালনামা - ইফতেখার আমীন

৬) মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ - মুনতাসীর মামুন

৭) একাত্তরের ঘাতক ও দাললরা-আজাদুর রহমান চন্দন

৮) ঘাতকের দিনলিপি - রমেন বিশ্বাস

৯) আলবদর - মুনতাসীর মামুন

১০) একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়

১১) পাকিস্তানি জেনারেলদের মন - মুনতাসীর মামুন

১৯৪৭'র পর থেকে পাকিস্তানি জেনারেলরা এই মতাদর্শটাকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে একজন মুসলিম সেনা পাঁচজন হিন্দু সেনার সমকক্ষ। তাদের বিশ্বাস ছিল, ভারতীয়রা এতই কাপুরুষ এবং অসংগঠিত যে, তারা কখনোই পাকিস্তানের জন্যে হুমকির কারণ হবে না। আইয়ুব খানও বিশ্বাস করতেন, Hindu morale would not stand more than a couple of hard blows at the right time and place। এমনকি পাকিস্তান যখন নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন তখনও রাষ্ট্র শাসিত মিডিয়া কাল্পনিক বিজয়ের ছবি দেখাচ্ছিল তাদের জনগণকে। ধর্মীয় সমমনা দলগুলো বড় বড় শহরের দেয়ালে পোস্টার সেটে দিচ্ছিল Crush India স্লোগানে। মুক্তিবাহিনী যখন যশোরে প্রবেশ করছিল এবং জনসাধারণ তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, Pakistan Times তখনও যশোরকে চিহ্নিত করছিল the Stalingrad of Pakistan হিসেবে। পত্রিকার সম্পাদক জেড এ সুলেরী এক প্রতিবেদনে লিখেন, Our solider is a wholly different species from others, especially from his Indian counterpart. He is armed in the weapons; but he is also armed in Iman [purity of Islamic faith]

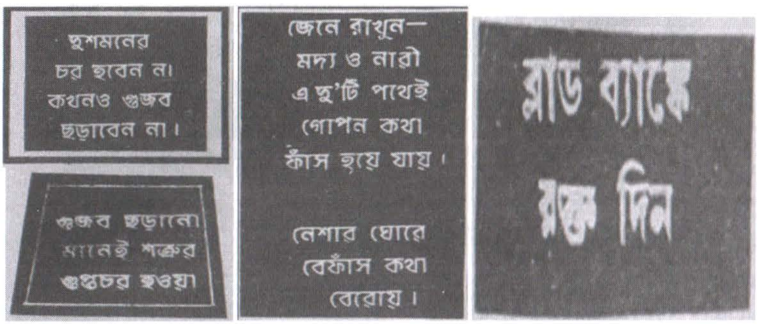
ধর্ম দিয়ে এমন মগজধোলাইয়ের এমন অসংখ্য উদাহরণ আগের পর্বগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবার আমরা চোখ দেব তাদের প্রোপ্যাগান্ডার জন্যে ব্যবহৃত আরেক মাধ্যমের দিকে বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি। যুদ্ধের মুহুর্তে দেশে ও দেশের ভেতরে প্রোপ্যাগান্ডা চালিয়ে জনসমর্থন আদায় করা যুদ্ধরীতির খুব পুরোনো রেওয়াজ। শুধুমাত্র জনসমর্থনই না, সৈনিকদের মনোবল বৃদ্ধি এবং শত্রুর প্রতি ঘৃণা তৈরির কাজেও এর উপকারিতা ব্যাপক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রোপ্যাগান্ডার অংশ হিসেবে আমেরিকায় ৩০০০ এর অধিক পোস্টার ডিজাইন করা হয়েছিল। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের কল্যাণে ২য় বিশযুদ্ধের সময় পোস্টারের পাশাপাশি রেডিও, নিউজরিল, লিফলেট, পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনও প্রোপ্যাগান্ডার কাজে ব্যবহারের জন্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য এর ফলে পোস্টারের ওপর নির্ভরশীলতা কিছুটা কমে গিয়েছিল।

এসব পোস্টার মূলত যুদ্ধকালীন রিক্রুট, অর্থ উত্তোলন, শ্রম উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য সংরক্ষণ এবং সৈনিক ও জনগণের মূল্যবোধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সাইকোলজিকাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় পোস্টার, লিফলেট কিংবা বিজ্ঞাপনে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ছবি মাধ্যমে শত্রুর নৃশংসতা ফুটিয়ে তোলা হয়, কিংবা বিভিন্ন নিজস্ব বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বের ছবি এবং তাদের বিখ্যাত উদ্ধৃতিও দেয়া হয়। এখানে একদিকে যেমন শত্রু চিহ্নিতকরণের বিভিন্ন

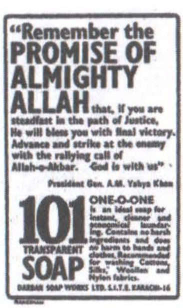
উপায় দেয়া থাকে তেমনি থাকে দেশপ্রেমের প্রসার ও চেতনা প্রচারের প্রচেষ্টা।

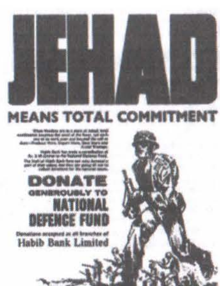
২

একাত্তরে দুই শিবির থেকেই চলছিল এই পোস্টার, লিফলেটে প্রচারণা। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে মিল রেখে প্রথমেই দেখব সে সময় পাকিস্তানি কিংবা তাদের দোসর কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন লিফলেট, বিজ্ঞাপন কিংবা পোস্টার। নিচের ছবিগুলো তখনকার *দৈনিক পূর্বদেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ছোট আকারের বিজ্ঞাপন অবশ্য এগুলো বেশ নিরীহ।

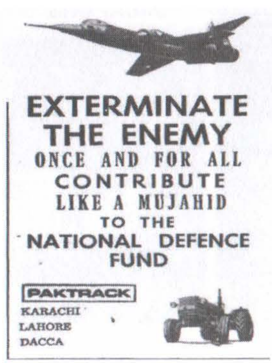


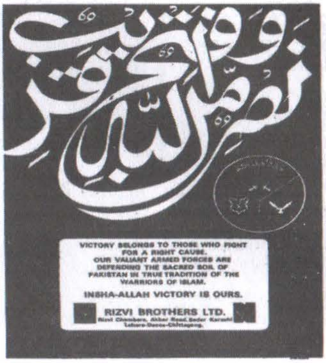
বলেছি, যুদ্ধকালীন রিক্রুট কিংবা অর্থ উত্তোলনে লিফলেট ও বিজ্ঞাপনের ব্যবহার ব্যাপক এবং সাইকোলজিকাল টেকনিক হিসেবে বিখ্যাতদের উক্তি ব্যবহারের প্রচলনও প্রচুর। এখানেই পাকিস্তানিরা নিয়ে আসে ধর্মকে, যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করায় ধর্মকে। উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয় কোরআন-হাদিসের আয়াতকে, এবং এর মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে তারা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে জিহাদ হিসেবে। ধর্মের প্রতি বরাবরই দুর্বল মুসলমানদের কাছে এরই মাধ্যমে তৈরি করা হয় এক বিশাল ফাঁদ। এখানে প্রমাণস্বরূপ দেখাব DAWN পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু বিজ্ঞাপন যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ এর ১৪-১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে।



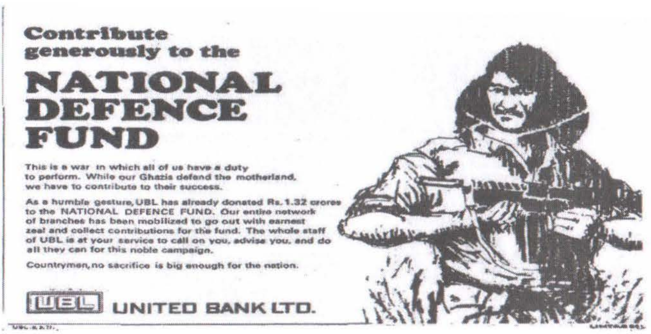


National Defence Fund' টাকা দানের জন্যে সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে এবং ডাক দেয়া হয়েছে জেহাদের। বিজ্ঞাপনের বামপার্শ্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ উক্তিও ব্যবহার করা হয়েছে, Remember the promise of Almighty Allah that, if you are steadfast in the path of Justice. He will bless you with final victory, advance and strike at the enemy with the rallying call of Allah – o Akbar. 'God is with us'. তার মানে একাত্তরে পাকিস্তনিদের পথ ছিল ন্যায়ের পথ, সাচ্চা মুসলমান বানানোর উদ্দেশ্যে চার লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করা তাহলে ন্যায়ের পথ?

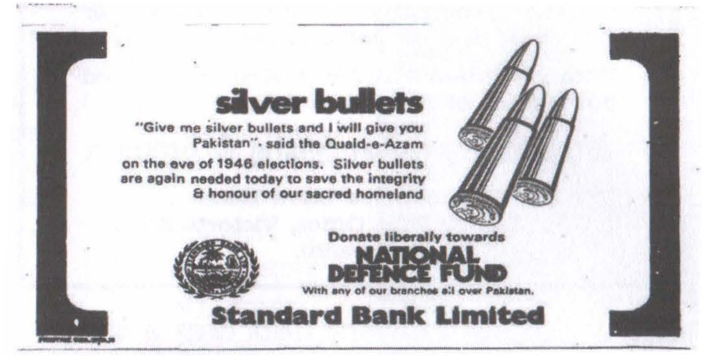




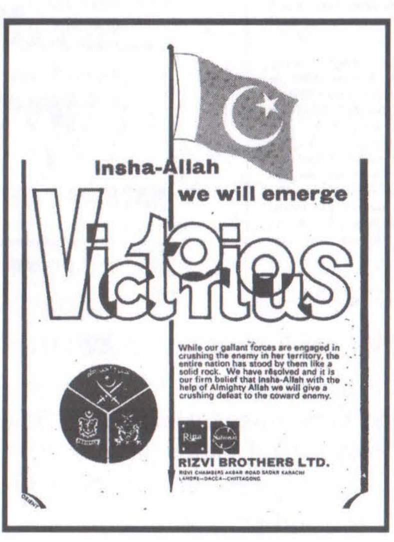
এই বিজ্ঞাপনেও শত্রুকে খতম এবং National Defence Fund' এ টাকা দানের জন্যে আহ্বান করা হয়েছে। ডান পাশে বক্সের মধ্যে লেখা আছে, Victory belongs to those who fight for a right cause. Our valiant armed forces are defending the sacred soil of Pakistan in true tradition of the warriors of Islam। কথাটার প্রথম লাইনের সাথে একমত, এর যৌক্তিকতাও আমরা দেখেছি; আসলেই সেদিন তাদেরই বিজয় হয়েছিল যারা যুদ্ধ করছিল for a right cause। শেষ লাইনটাতে পাকিস্তানি পশুদেরকে (সৈনিকদের) আবার ইসলামের যোদ্ধা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।



এটাও যথারীতি টাকা উত্তোলনের জন্যে তৈরিকৃত বিজ্ঞাপন। This is a war in which all of us have a duty to perform. While our Gahzis defend the motherland, we have to contribute to their success.



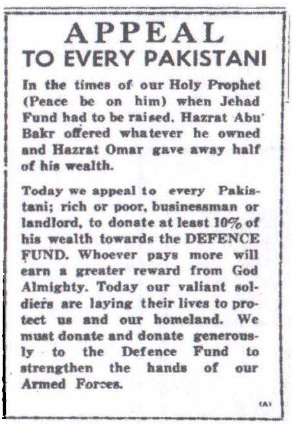
তহবিল গঠনের জন্যে তৈরিকৃত বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে জিন্নাহর উক্তি, Give me silver bullets and I will give you Pakistan. এই সিলভার বুলেট কি কাজে লেগেছিল সেটা সবচেয়ে ভালোভাবে টের পেয়েছিল একাত্তরের বাঙালিরা।

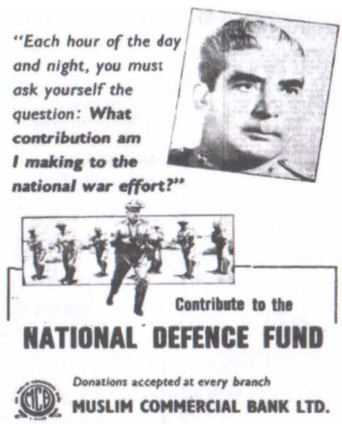


Insh-Allah we will emerge Victorious!



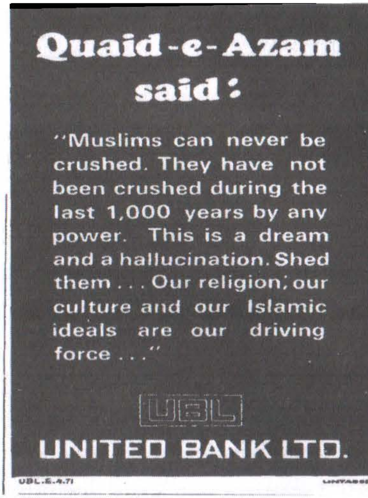
মহিলাদেরকে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে জেহাদ এ কন্ট্রিবিউট করতে ডাক দেয়া হচ্ছে এই বিজ্ঞাপনে। এখানেও এসেছেন জেহাদ প্রসঙ্গ।





এই বিজ্ঞাপন ধর্মকে ব্যবহারের এক অন্যতম উদাহরণ। নবী যুগ এর একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করা হয়। In the time of our Holy Prophet (peace be on him) when Jehad Fund to be raised, Hazrat Abu Bakar coffered whatever he owned and Hazrat Omar gave away half of his wealth নবীজী (স) এর দুই সাহাবী আবু বকর (রা) এবং উমর ফারুক (রা) এর এই ঘটনা শুরুতেই উল্লেখ করে প্রতি পাকিস্তানির কাছে তাদের সম্পদের ১০% Defence Fund এ জমা দেয়ার আহ্বান করা হয়। সেই সাথে বলা হয় যে যত বেশী দান করবে সে আল্লাহর কাছ থেকে তত বেশী পুরস্কার (সওয়াব) পাবে!

এখানে কায়েদ–এ–আজম এর উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, Muslims can never be crushed. They have not been crushed during the last 100 years by any power. This is a dream and a hallucination. Shed them... Our religion, our culture and our Islamic ideals are our driving force....”। তার মানে তারাই শুধু মুসলিম ছিলেন! আর তাদের (পাকিস্তানি) আদর্শের নমুনাতো আমরা দেখেছি একাত্তরের পুরো নয় মাস জুড়েই।



এই বিজ্ঞাপনগুলোতে ধর্মের ব্যবহারের চিত্রটা স্পষ্ট এবং এখানে যেমন ধর্মকে ব্যবহার অর্থ্যাৎ জেহাদ ঘোষণা দিয়ে জনসাধারণের সমর্থন আদায় করা ও তহবিল গঠন করার চেষ্টা দৃশ্যমান, ঠিক তেমনি আরেকটা বিষয় লুকিয়ে আছে এর আড়ালে। পাকিস্তানিরা যে বাঙালিদের ইসলামের শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত করতো এবং এই চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তারা যে তাদের জঘন্য কর্মকাণ্ডের বৈধতা দানের চেষ্টা করতো এর প্রমাণও পাওয়া যায় এই বিজ্ঞাপনগুলোতে। এ বিষয়ে ‘মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনে পাকিস্তানি মানস’ প্রবন্ধে সাব্বির হোসাইনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, “পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে একাত্তরে ওরা বাংলাদেশে ধর্মযুদ্ধ করছিল, তাই তাদের কাছে এই অঞ্চলের অধিকৃত অংশের অমুসলিম নারীরা যুদ্ধলুট (War Booty)। যুদ্ধের সময় যুদ্ধলুট হিসেবে বন্দি হওয়া নারীদের সাথে তাদের অসম্মতিতে সঙ্গম মানে ধর্ষণ করা, তাদের যৌনদাসী হিসেবে বন্দি করে রাখাকে পাকিস্তানিরা বৈধ মনে করতো। এবং মুসলিম বাঙালিদের যেহেতু ওরা অবিশুদ্ধ মুসলমান, ও ইসলামের শত্রু ভাবতো, তাই পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে এসব অবিশুদ্ধ মুসলমান বাঙালি নারীরাও যুদ্ধলুট, এদের ধর্ষণ করা বৈধ”।

একাত্তরের ৩১ মার্চে New York Times’র ‘In the name of Pakistan’ শীর্ষক এক প্রতিবেদনেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, বলা হয়, “স্রষ্টা ও অখন্ড পাকিস্তানের নামে পশ্চিম পাকিস্তানি প্রাধান্যের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর উপর নির্মম সেনা আক্রমণ চালিয়েছে ”। Acting in the name of God and a united Pakistan forces of West Pakistan – dominated military government of President Yahya Khan have dishonoured both by their ruthless crackdown on the Bengali majority seeking

a large measure of autonomy for their homeland in the country's eastern region.

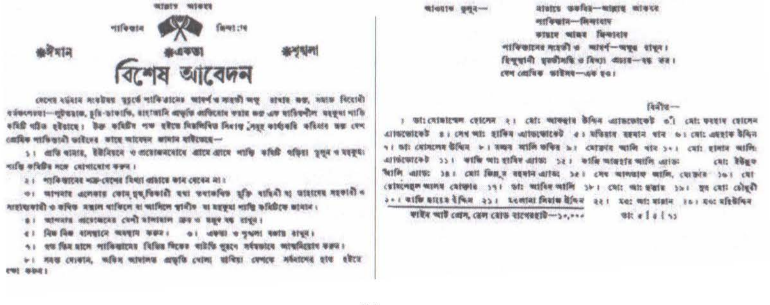
৩

দেশীয় দালালরাও পিছিয়ে ছিল না, তারাও লিফলেট এবং হাতে লেখা প্রচারপত্র বিলি করছিল জনসাধারণের মাঝে। শান্তি কমিটি কিংবা জামায়াতে ইসলামী কয়দিন পর পর জনসভার আয়োজন করত। এ উপলক্ষে তারা বিলি করতো লিফলেট। তাদেরও উদ্দেশ্য মোটামুটি একই, জনসমর্থন আদায়, এবং সেখানেও ছিল প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মের ব্যবহার।

বাগেরহাট শান্তি কমিটি ৫ মে ১৯৭১ সালে বাগেরহাটবাসীর উদ্দেশে ১০ হাজার প্রচারপত্র ছেপে বিলি করে। প্রচারপত্রের শিরোনামঃ বিশেষ আবেদন। প্রচারপত্র শুরু হয়েছে আল্লাহু আকবর এবং পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়ে। পরবর্তীতে, তাদের তিনটি মূলমন্ত্রের কথা উল্লেখ করা আছে ইমান, একতা, এবং শৃঙ্খলা। আবেদনের শুরুতেই বলা হয়, 'দেশের বর্তমান সঙ্কটময় মুহূর্তে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সমাজবিরোধী কর্মতৎপরতা, লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি প্রতিরোধ করার জন্য এক দায়িত্বশীল মহকুমা শান্তি কমিটি গঠিত হইয়াছে'।

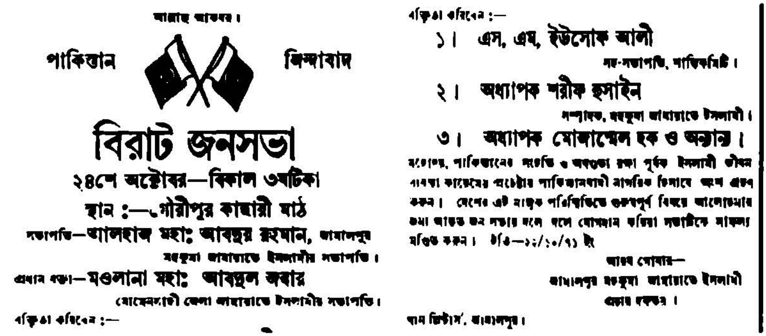
তারপর মোট ৯টি আবেদন করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৩য় আবেদনটি ছিল, 'আপনার এলাকায় কোন দুষ্কৃতিকারী যথা তথাকথিত মুক্তিবাহিনী বা তাহাদের সহকারী ও সাহায্যকারী ও কথিত নকশাল থাকিলে বা আসিলে স্থানীয় বা মহকুমা শান্তি কমিটিকে জানান'। সবশেষে যথারীতি তাদের শ্লোগানের সহিত গলা মেলানোর তাগিদ দেয়া হয়–

নারায়ে তাকবির–আল্লাহু আকবর
পাকিস্তান জিন্দাবাদ
কায়েদে আজম জিন্দাবাদ
পাকিস্তানের সংহতী ও আদর্শ–অক্ষুণ্ন রাখুন।
হিন্দুস্থানী দুরভীসন্ধি ও মিথ্যা প্রচার- বন্ধ কর।
দেশপ্রেমিক ভাইসব–এক হও।


ঈমান একতা শৃঙ্খলা
বিশেষ আবেদন
বিনীত—

জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে বিভিন্ন জায়গাতেই জনসভার আয়োজন করত যেখানে সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করা হত মুক্তিযুদ্ধের। তেমনি এক জনসভার আয়োজন করা হয় জামালপুরের গৌরীপুর কাছারী মাঠে ২৪ অক্টোবর। এ কারণে জামালপুর মহকুমা জামায়াতে ইসলামীর প্রচার দফতরের উদ্যোগে বিলি লিফলেট করা হয়েছিল। লিফলেট অনুসারে সে জনসভার সভাপতি ছিলেন সেখানকার জামায়াত নেতা আলহাজ মহাঃ আব্দুর রহমান। শান্তি কমিটির সহ সভাপতি এস এম ইউসোফ আলীও বক্তৃতা করবেন বলে লিফলেটে জানা যায়।

জামায়াতে ইসলামীদের প্রচারিত সে লিফলেটে আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছিল, 'মহোদয়, পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষাপূর্বক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানবাদী নাগরিক হিসেবে অংশগ্রহণ করুন। দেশের এই নাজুক পরিস্থিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য আহূত জনসভায় দলে দলে যোগদান করিয়া সভাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।' তার মানে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করলেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম হয়ে যাবে!



আল্লাহ আকবর।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

বিরাট জনসভা

২৪শে অক্টোবর—বিকাল ৩ঘটিকা

স্থান :—গৌরীপুর কাছারী মাঠ

সভাপতি—আলহাজ মহাঃ আবদুর রহমান, জামালপুর মহকুমা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি।

প্রধান বক্তা—মওলানা মহাঃ আবদুল জব্বার মোমেনশাহী জেলা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি।

বক্তৃতা করিবেন :—

১। এস, এম, ইউসোফ আলী সহ-সভাপতি, শান্তিকমিটি।

২। অধ্যাপক শরীফ হুসাইন সম্পাদক, মহকুমা জামায়াতে ইসলামী।

৩। অধ্যাপক মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য।

মহোদয়, পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা পূর্বক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানবাদী নাগরিক হিসাবে অংশ গ্রহণ করুন। দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য আহুত জনসভায় দলে দলে যোগদান করিয়া সভাটিকে সাফল্য মণ্ডিত করুন। তাং—১২/১০/৭১ ইং

প্রচার দফতর—
জামালপুর মহকুমা জামায়াতে ইসলামী

[তথ্যসূত্র: মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিল পত্র-মুনতাসীর মামুন]

যশোরেও এ ধরণের আয়োজনের লিফলেট পাওয়া যায়, সেটা অবশ্য যশোর জেলা শান্তি কমিটি আয়োজন করেছিল। ১৬ জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে এ জনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি ছিলেন জনাব সৈয়দ শামসুর রহমান। প্রশ্ন হতে পারে এই শহীদ কারা? পাকিস্তানি দালালরা, রাজাকাররা। লিফলেটে বলা হয়,

ভাইসব,
আচ্ছালামু আলাইকুম!
আসছে শুক্রবার বৈকাল ৪ টায় যশোর টাউন হল ময়দানে জেলার ২১জন বীর রেজাকারের আত্মত্যাগের জন্য তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হবে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার্থে শত্রুর মোকাবেলায় উহারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অমর হয়েছেন।

আসুন দলে দলে সভায় যোগদান করে অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।

আমজাদ হোসেন

সম্পাদক

যশোর জেলা শান্তি কমিটি

শহীদ দিবস উপলক্ষে

জনসভা

স্থান—টাউন হল ময়দান

সভাপতি—জনাব সৈয়দ শামছুর রহমান

তাং—১৬।৭।৭১ শুক্রবার বৈকাল ৪টা

ভাইসব !

আস্সালামু আলায়কুম।

আস্‌ছে শুক্রবার বৈকাল ঠিক ৪টায় যশোর টাউন হল ময়দানে জেলার ২১ জন বীর রেজাকারের আত্মত্যাগের জন্য তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হবে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার্থে শত্রুর মোকাবেলায় উঁহারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অমর হয়েছেন।

আসুন দলে দলে সভায় যোগদান ক'রে অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।

আমজাদ হোসেন
সম্পাদক
যশোর জেলা শান্তি কমিটি।

জেলা পরিষদ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রচার সম্পাদক মো: জাহেদ উদ্দীন আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত।

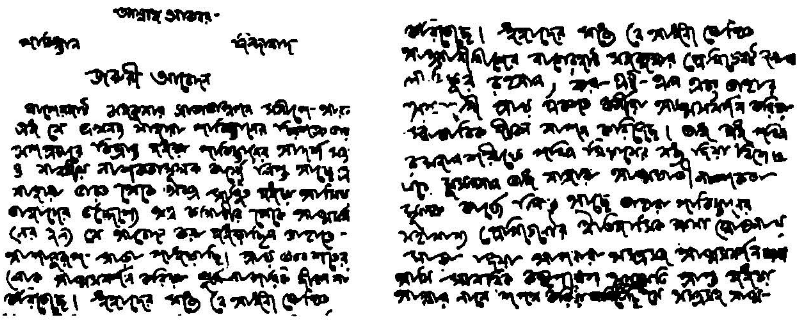
[তথ্যসূত্র: মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিল পত্র–মুনতাসীর মামুন]

এই প্রচারপত্রটা হাতে লিখে সাইক্লোস্টাইলে হুবহু কপি করে বিলি করা হয়েছিল। আসলে এ ধরণের হাতে লিখা প্রচারপত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় দু' পক্ষই ব্যবহার করতো, কেননা অনেক সময় প্রচারপত্র ছেপে বিলি করা সম্ভব হত না। বাগেরহাট শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মো: রজ্জব আলি ফকির। রজ্জব আলী ছিলেন মুসলিম লীগ কর্মী, একাত্তরে হানাদারদের পক্ষে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন পাকিস্তানিদের কাছে। খুশি হয়ে তাকে রাজাকার মেজর উপাধি দেয়া হয়। রমজান মাসে বাগেরহাটে জরুরী আবেদন শিরোনামে হাতে লিখে এই রাজাকার মেজর একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। প্রচারপত্র যথারীতি শুরু হয়েছিল *আল্লাহু আকবর* এবং *পাকিস্তান জিন্দাবাদ* দিয়ে।

জরুরী আবেদনে বলা হয়, "বাগেরহাট মহকুমার ভ্রাতাভগ্নিগণ সমীপে আরজ এই যে, এখনও যাহারা পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারতের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া পাকিস্তানের আদর্শ সংহতি ও যাবতীয় নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত আছে এবং যাহারা ভারত থেকে অস্ত্র সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যে অত্র কমিটির পক্ষ থেকে আত্মসমর্পনের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল তাহাতে আশানুরূপ সাড়া পাইয়াছি। প্রায় ৫০০ জনের ন্যায় লোক আত্মসমর্পণ করিয়া পূর্ণ নাগরিক জীবন যাপন করিতেছে। তাই এই পবিত্র রমজান শরীফে পবিত্র সিয়ামের মধ্য দিয়া বিশেষ করে মুসলমান ভাই যাহারা আত্মঘাতী নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত আছে

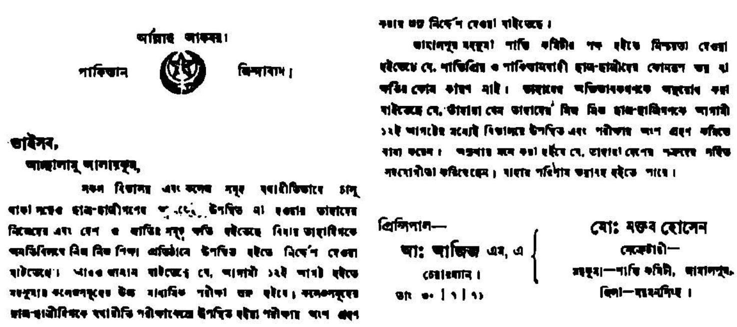
তাহারা পাকিস্তানের মহামান্য প্রেসিডেন্টের ঐতিহাসিক ক্ষমা ঘোষণায় সাড়া দিয়া আপনারা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পন করুন।'

রজ্জব আলী সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে আহ্বান জানিয়েছেন, 'পবিত্র রমজান মাসে যারা আত্মসর্পণ করিবে তাহাদের নিশ্চয় ক্ষমা করা হইবে'। রজ্জব আলী আরো জানিয়েছিলেন, মুক্তিযোদ্ধারা নির্মমভাবে "নিরীহ মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাইতেছে। বিশেষ করিয়া প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন, ওরফে খোকন যাহারা ভারতের প্রভুদের তুষ্ট করিবার জন্য অনেক নিরীহ মুসলমানদের রক্তে এই বাগেরহাটের মাটিকে রঞ্জিত করিয়াছে শেষ পর্যন্ত তাহারাও এই জালেমদের হইতে রক্ষা পায় নাই"। উল্লেখ্য, ৫০০ জনের আত্মসমর্পনের ঘটনাটা, মুনতাসীর মামুনের মতে, অতিরঞ্জিত অথবা মিথ্যা।



[তথ্যসূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিল পত্র–মুনতাসীর মামুন]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল যাতে তারা নিজ নিজ সন্তানদের শিক্ষালয়ে পাঠান। শিক্ষালয়ে উপস্থিত থাকলে সরকার প্রচার করতে পারবে যে সব স্বাভাবিক। জামালপুর শান্তি কমিটি দ্বারা প্রচারিত নিচের লিফলেটটি বিলি করা হয়েছিল এ কারণেই।



আল্লাহু আকবর।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

ভাইসব,

আচ্ছালামু আলায়কুম,

সকল বিদ্যালয় এবং কলেজ সমূহ যথারীতিভাবে চালু থাকা সত্বেও ছাত্র-ছাত্রীগণের [illegible] উপস্থিত না হওয়ায় তাহাদের নিজেদের এবং দেশ ও জাতির সমূহ ক্ষতি হইতেছে বিধায় তাহাদিগকে অবিলম্বে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। আরও জানান যাইতেছে যে, আগামী ১২ই আগষ্ট হইতে মহকুমার কলেজসমূহের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হইবে। কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে যথারীতি পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

জামালপুর মহকুমা শান্তি কমিটির পক্ষ হইতে নিশ্চয়তা দেওয়া হইতেছে যে, শান্তিপ্রিয় ও পাকিস্তানবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের কোনরূপ ভয় বা ক্ষতির কোন কারণ নাই। অতএব অভিভাবকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাহাদের নিজ নিজ ছাত্র-ছাত্রীগণকে আগামী ১২ই আগষ্টের মধ্যেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত এবং পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। অন্যথায় মনে করা হইবে যে, তাহারা দেশের শত্রুদের সহিত সহযোগীতা করিতেছেন। যাহার পরিণাম ভয়াবহ হইতে পারে।

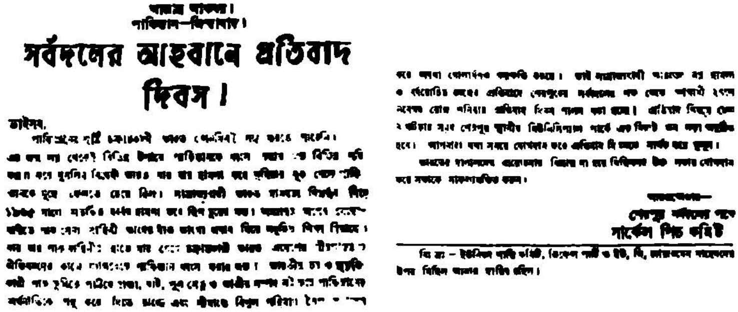
প্রিন্সিপাল—
আঃ আজিজ এম, এ
চেয়ারম্যান।
তাং ৩০।৭।৭১

মোঃ মকবুল হোসেন
সেক্রেটারী—
মহকুমা—শান্তি কমিটি, জামালপুর।
জিলা—ময়মনসিংহ।

[তথ্যসূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিল পত্র–মুনতাসীর মামুন]

শেরপুরের পিস কমিটি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে ২৭ নভেম্বর এক প্রতিবাদী জনসভার আয়োজন করে; এ উপলক্ষে প্রচারিত লিফলেটে বলা হয়

"ভাইসব
পাকিস্তানের সৃষ্টি চক্রান্তকারী ভারত কোন দিনই সহ্য করতে পারে নি। এর জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন উপায়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করে মুসলিমবিদ্বেষী ভারত বারবার হামলা করে দুনিয়ার বুক থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ভারত মানবতা বিসর্জন দিয়ে ১৯৬৫ সালে অতর্কিত বর্বর হামলা করেছিল চুরের মতো। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পাক সেনাবাহিনীর হাতে মার খেয়ে চক্রান্তকারী ভারত এ দেশের মীর জাফর ও বিভীষণদের কাজে লাগিয়েছে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য। ভারতীয় চর ও দুষ্কৃতিকারী পাক ভূমিতে পাঠিয়ে রাস্তা, ঘাট, পুল, সেতু ও জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে চাচ্ছে এবং সীমান্তে বিপুল পরিমাণ সৈন্য মোতায়েন করে অযথা গোলাবর্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি করছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী ভারতের নগ্ন হামলা ও বর্বরোচিত কাজের প্রতিবাদে শেরপুরের সর্বদলের পক্ষ থেকে আগামী ২৭ নভেম্বর রোজ শনিবার প্রতিবাদ দিবস পালন করা হচ্ছে... ।... আপনারা যথা সময়ে যোগদান করে প্রতিবাদ দিবসকে সার্থক করে তুলুন।"

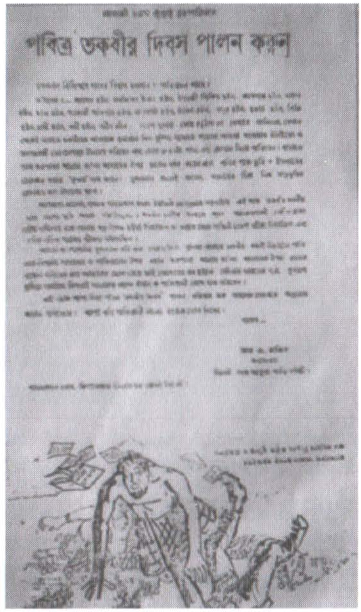

সর্বদলের আহবানে প্রতিবাদ দিবস।

[তথ্যসূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিল পত্র-মুনতাসীর মামুন]

২৯ জুলাইকে *পবিত্র তকবীর দিবস* ঘোষণা করে সেটা পালনের আহ্বান জানায় সিলেট সদর মহকুমা শান্তি কমিটি। এ উপলক্ষে শান্তি কমিটির কনভেনার ডা এ মজিদের সাক্ষর সংবলিত এক লিফলেট প্রচার করা হয় তাদের পক্ষ থেকে। এই লিফলেট ধর্মকে ব্যবহারের এক জলন্ত উদাহরণ। পবিত্র তকবির দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে সে প্রচারপত্রে বলা হয়,

"মুসলমান নির্বিশেষে যাদের বিশ্বাস ইসলাম পাকিস্তানে আছে, তাঁহারা আলেম হউন, মসজিদের ইমাম হউন, ইংরেজি শিক্ষিত হউন, প্রফেসর হউন, মাস্টার হউন, ছাত্র হউন, সরকারি অফিসার হউন, ব্যবসায়ী হউন, উকিল হউন, মজুর হউন, মুক্তার হউন, শিল্পি হউন, চাষি হউন, ধনী হউন, গরিব হউন, ২৯ জুলাই ভোর ...টায় (সময়টা স্পষ্ট না) যে যেখানে থাকিবেন, সেখান থেকেই নারায়ে তাকবীর আওয়াজ শোনামাত্র দিল খুলিয়া সজোরে আল্লাহু আকবর আওয়াজ উঠাইবেন ও তৎপরবর্তী স্লোগানসমূহ উচ্চারণ করিবেন এবং ভোর ...টায় (সময়টা স্পষ্ট না) পর্যন্ত এই স্লোগান দিতে থাকিবেন। যাহাতে পরম করুণাময় আল্লাহ তালা আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করে এবং

পবিত্র পাক ভূমি ও ইসলামের হেফাজত করার কুওত দান করেন। মুসলমান মাত্রই জানেন, তাহাদের নিজ নিজ মাতৃভূমির হেফাজত করা ঈমানের অংশ।......"


পবিত্র তকবীর দিবস পালন করুন

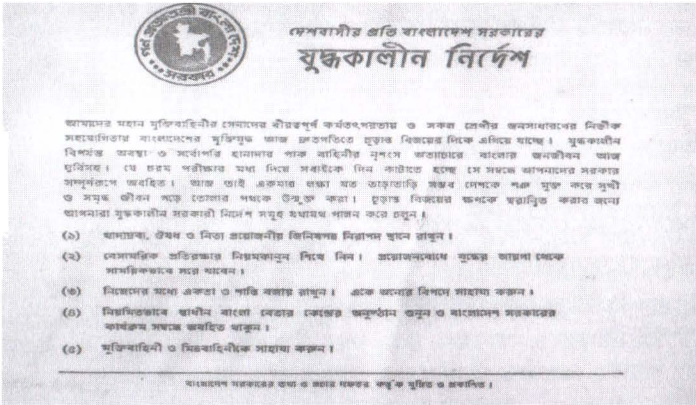
এই অনুষ্ঠান আয়োজন ও এ উপলক্ষে প্রচারিত উপরোক্ত লিফলেট পাকিস্তান ও ইসলামকে একই মোড়কে উপস্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের অপব্যবহারের এক অনন্য নজির। [সূত্র: সিলেটে যুদ্ধাপরাধ ও প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র-অপূর্ব শর্মা]

৪

আমাদের মূল বিষয়ের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কিত না, তবুও বাংলাদেশ শিবির হতে প্রচারিত লিফলেট কিংবা পোস্টার নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার । পাকিস্তানি কিংবা দালালদের দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত বিজ্ঞাপন ও লিফলেটে যেমন ধরা পড়ে তাদের মানসিকতার ধরন তেমনি মুজিবনগর সরকার হতে প্রকাশিত ও প্রচারিত পোস্টার ও লিফলেটে ফুটে ওঠে স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত একটি নতুন রাষ্ট্রের চিন্তা চেতনা। প্রসঙ্গত, মুজিব নগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এই লিফলেট কিংবা প্রচারপত্রগুলোকে পাকিস্তানি সরকারও বেশ গুরুত্ব দিত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি মাসে দুটি গোপন প্রতিবেদন পাঠানো হত পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে। এই গোপন প্রতিবেদনগুলোতে বিভিন্ন লিফলেট ও পোস্টার সম্পর্কিত আলোচনা লিপিবদ্ধকরণ প্রমাণ করে এগুলোর প্রতি পাকিস্তানিদের গুরুত্ব। [সূত্র: একাত্তরের গোপন দলিল -আরিফুর রহমান]

জনগণের প্রতি বিভিন্ন ধরণের নির্দেশাবলী দিতে ও মনোবল অক্ষুণ্ন রাখতে বিলি করা লিফলেটগুলোতে মূলত যা থাকত তা নিম্নরূপ:

গুজবে কান দেবেন না, গুজব রটনাকারীকে ধরিয়ে দিন।
মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনার কথা গোপন রাখুন।
পাক বাহিনীর গতিবিধির খবর মুক্তিবাহিনীকে জানিয়ে দিন।
শত্রুর সরবরাহ সম্পূর্ণ বিপযস্ত করে দিন।
বিমান আক্রমণের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দিন।
মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।
মনে রাখবেন, শত্রুর প্রতিটি বুলেট আপনার পয়সায় কেনা, ইত্যাদি... ।



দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের

যুদ্ধকালীন নির্দেশ

আমাদের মহান মুক্তিবাহিনীর সেনাদের বীরত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতায় ও সকল শ্রেণীর জনসাধারণের নির্ভীক সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আজ দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত অবস্থা ও সর্বোপরি হানাদার পাক বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারে বাংলার জনজীবন আজ দুর্বিসহ। যে চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সবাইকে দিন কাটাতে হচ্ছে সে সম্বন্ধে আপনাদের সরকার সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আজ তাই একমাত্র লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশকে শত্রু মুক্ত করে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলার পথকে উন্মুক্ত করা। চূড়ান্ত বিজয়ের ক্ষণকে ত্বরান্বিত করার জন্য আপনারা যুদ্ধকালীন সরকারী নির্দেশ সমূহ যথাযথ পালন করে চলুন।

(১) খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিরাপদ স্থানে রাখুন।

(২) বেসামরিক প্রতিরক্ষার নিয়মকানুন শিখে নিন। প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের জায়গা থেকে সাময়িকভাবে সরে যাবেন।

(৩) নিজেদের মধ্যে একতা ও শান্তি বজায় রাখুন। একে অন্যের বিপদে সাহায্য করুন।

(৪) নিয়মিতভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনুন ও বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত থাকুন।

(৫) মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করুন।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আবার, দেশের ভেতরে অবরুদ্ধ বাঙালিদের উদ্দীপ্ত করা হত বিভিন্ন লিফলেটের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, কে ফোর্সের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এ ধরণেরই দু' পাতার এক লিফলেট প্রচার করেন। শিরোনাম ছিল, বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে। লিফলেটে বিভিন্ন ধরণের নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে; সেগুলোকে আবার চার ভাগে ভাগ করে মুক্তিযোদ্ধা ও আপনি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মিলিটারি। তবে প্রচারপত্রের শুরুতেই যা বলা হয়েছে সেটা যেমন অনবদ্য, তেমনই প্রেরণাদায়ক। "জনগণই মুক্তিযোদ্ধাদের চলার, বাঁচার, অগ্রসর হওয়ার, জয়ী হওয়ার একমাত্র অবলম্বন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ যে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত তা সম্পূর্ণভাবে জনগণেরই যুদ্ধ। জনতার প্রতিটি অংশ, সমস্ত শক্তি এতে একত্রিত। গণবাহিনীর চরিত্র অনুযায়ী প্রত্যেক বাঙালি আজ যুদ্ধরত কেউ সশস্ত্র, কেউ নিরস্ত্র। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নাই। তবে কেউই অতিরিক্ত নয়, প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা আছে এই যুদ্ধে এবং সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কেউ যেন হুকুমের অপেক্ষায় বসে না থাকে। কেউ যেন না ভাবে যে হাতিয়ার ছাড়া বা সামরিক ট্রেনিং ছাড়া এই যুদ্ধে অংশ নেয়া সম্ভব নয়"।

মুজিব নগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পোস্টারগুলোতে সাধারণত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিংবা তাজউদ্দীন আহমদের উক্তি, তাদের ছবি, মুক্তিবাহিনীর ছবি কিংবা ইয়াহিয়া ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মমতার কথা উল্লেখ থাকতো। যেমন "পাকিস্তান আজ মৃত', 'ইয়াহিয়া হিটলারকেও লজ্জা দিয়েছে' ধরণের প্রচারপত্রের পাশাপাশি 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' কিংবা 'শত শোষণেও বাংলাদেশ স্বর্ণ প্রসবিনী' ধরণের প্রচারপত্রও প্রচার করা হত বাংলাদেশ শিবির থেকে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পাকিস্তানিরা তাদের প্রচারপত্রে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগতভাবে; পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতির ছোয়া ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতার আবহ।

'বাংলার হিন্দু/ বাংলার খ্রিষ্টান/ বাংলার বৌদ্ধ/ বাংলার মুসলমান/ আমরা সবাই বাঙালি' - শিরোনামের প্রচারপত্র মূলত সেই ধর্মীয় নিরপেক্ষতার পরিচয়ই বহন করে। এখানেই পাকিস্তানি আদর্শের সাথে স্বাধীনতাকামী বাঙালির আদর্শের মূল তফাৎ ছিল।

তথ্যসূত্র:

১) মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র- মুনতাসির মামুন

২) 1971 'Jihad': Print ads from West Pakistan – DAWN [16/12/2015]

৩) Images of Propaganda: World War I and World War II Posters - Mary M. Rider

৪) An Analysis of American Propaganda in World War II and the Vietnam War - Connor Foley Follow, Bridgewater State University.

৫) Pakistan-Between Mosque and Military - Hussain Haqqani

৬) সিলেটে যুদ্ধাপরাধ ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র-অপূর্ব শর্মা

৭) একাত্তরের গোপন দলিল-আরিফুর রহমান

৮) New York Times, 31. 03. 1971

৯) মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনে পাকিস্তানি মানস-সাব্বির হোসাইন

ধর্মের ভাষ্য

ফুল পাতিয়ে গোলাপ বেলী
একই মায়ের বুকে খেলি,
পাগলা তা'রা আল্লা ভগবানে ভাবে ভিন্ন যারা। - কাজী নজরুল ইসলাম

পূর্বকথা

শুরুতেই দুটো প্রশ্ন আমাদের সামনে আসতে পারে; ১) ধর্মকে কেন ব্যবহার করা হলো এবং ২) কিভাবে করা হলো?

রাজনীতিতে "ধর্ম" কে ব্যবহারের ইতিহাস অনেক পুরনো; শাসক শোষক শ্রেণি সবসময়েই নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে কোন না কোনভাবে ধর্মকে ব্যাবহার করেছে- সেটা দাস যুগ থেকে শুরু করে এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত সব জায়গাতেই দৃশ্যমান। প্রতি ধর্মই তাদের প্রাথমিক যুগে, মানে উত্থানের যুগে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে বেশ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করলেও সে ধর্মগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাসক -শোষক শ্রেনি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যেই ধর্মকে ব্যবহার করে। আমাদের উপমহাদেশে মানুষদের নিজস্ব ধর্ম ও ধর্মীয় চেতনার ব্যাপারে বিদ্যমান প্রবল আবেগকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না এবং যে কোন আন্দোলন সংস্কারে ধর্মকে ব্যবহারের রেওয়াজের ইতিহাসটাও এই পরিবেশে বেশ পুরনো। এখানে আহমদ শরীফের উদ্ধৃতিটা প্রাসঙ্গিক, সেকালের রাজনীতির, সমাজ সংস্কারের কিংবা জীবিকাক্ষেত্রে নতুন নিয়ম রীতি প্রবর্তনের উপায় ছিল নতুন ধর্মমত প্রচার কিংবা পুরোনো শাস্ত্রের সংস্কার আন্দোলন। এমন কি দস্যুবৃত্তি কিংবা বিপ্লব করতেও ধর্ম ব্যবহৃত হত আবরণ হিসেবে। এ সূত্রে আঠারো শতকের ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহও স্মতর্ব্য। মাটির ও মানুষের প্রতি দায়িত্বচেতনা, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার আধুনিক ধারণা তখনো অঙ্কুরিত হয়নি বলে ধর্মভাবের প্রেরণা এবং স্বাধর্ম্যই ছিল ঐক্যের বন্ধনসূত্র"।

আধুনিক যুগে এসে আধুনিক রাজনীতিবিদরাও রাজনীতিকে ধর্মীয়করণ কিংবা ধর্মকে রাজনীতিকরণের মাধ্যমে সহজ সরল ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু জনসাধারণের চিন্তা চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের রাজপথে টেনে এনেছেন বারে বারে; ব্যবধান বাড়িয়েছেন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে। উল্লেখ্য, বাংলায় যেহেতু মূলত হিন্দু-মুসলিম- এ দুটো ধর্মের উপস্থিতি সর্বাধিক, ব্রিটিশরাও তাদের সিংহাসনটিকে অটল রাখার উদ্দেশ্যে 'ডিভাইড এন্ড রুল' পদ্ধতিতে এই হিন্দু মুসলিম ভেদনীতির বীজটাকে বপন করেছিলে কলেকৌশলে। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত জনসাধারণের আবেগের এই তীব্রতা, ৪৭ এর দেশভাগের সময়কালীন সাম্প্রদায়িকতার চাপা উত্তেজনা এবং সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল ধর্ম সম্পর্কে

জনসাধারণের অপ্রতুল জ্ঞান যা পাকিস্তানিদের উদ্দীপনা জুগিয়েছিল ও সুবিধা দিয়েছিল ধর্মকে ব্যবহার করতে।

লেখক ও গবেষক বদরুদ্দীন উমর *ধর্মনিষ্ঠা*, *সাম্প্রদায়িকতা* এবং *ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার* এই শব্দগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ধর্মনিষ্ঠা হচ্ছে সহজ ভাষায় একজন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্মীয় চেতনা- আচার-বিচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য; কিন্তু সে আনুগত্য যখন অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্প্রদায় গত ভাবে বিদ্বেষ জন্ম দেয় এবং ক্ষতিসাধনে প্রস্তুত থাকে তখন সেটা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এক নয় যদিও বেশীরভাগের কাছে একই বলে মনে হয়; বরং সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারেরই এক নির্দিষ্ট রূপ, কিন্তু একমাত্র নয়। সাম্প্রদায়িকতা যেখানে 'একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অন্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্থাপন ও পরিচালনা করা কিংবা একই শ্রেনি কাঠামোর মধ্যেই দুই বা তার অধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি, চাকরি এবং পার্লামেন্টে আসন ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্ব বিরোধিতা' সেখানে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মূল কারণ 'জনগণের চিত্তকে শাসন করা ও চিন্তা চেতনাকে বশবর্তী রাখা'।

একাত্তরের যাবতীয় দলিল-বইপত্র থেকে আমরা একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ করি পাকিস্তানি শাসকদের মন-চিন্তা-চেতনার সাম্প্রদায়িকতা আবার অন্যদিকে বিভিন্ন পাপকার্যের বৈধতা দানের চেষ্টার মাধ্যমে ধর্মের রাজনৈতিক মূল যে ব্যবহারটা -জনগনের চিত্তকে শাসন করা ও চিন্তা চেতনাকে বশবর্তী রাখা- সেটাও পরিষ্কার হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানেই বিগত পর্বগুলো আলোচনার প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানিদের লেখা বইপত্র, সাক্ষাৎকার, দোসরদের বক্তৃতা- বিবৃতি, কর্মকাণ্ড এবং তাদের প্রকাশিত ও প্রচারিত পত্র পত্রিকার সূত্র থেকে ধর্মকে ব্যবহারের যে পদ্ধতি কিংবা নমুনা আমাদের সামনে ভেসে উঠে সেটা নিম্নরূপঃ

১) মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর হত্যাকাণ্ডকে বৈধতাদানের জন্যে নিহতদের আখ্যায়িত করা হয়েছে ইসলামের শত্রুই হিসেবে;
২) নারী ধর্ষণ করে পরবর্তীতে সেটাকে গনিমতের মাল বলে জায়েজিকরণের চেষ্টা করেছে;
৩) সওয়াবের আশায় ধর্মান্তরিত করা হয়েছে হিন্দুদের;
৪) পাকিস্তানকে আল্লাহর ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং
৫) প্রতি বক্তৃতা- বিবৃতিতে পাকিস্তান ও ইসলামকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, পাকি ও শান্তি কমিটির লোকেরা প্রায়ই রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু কবি হিসেবে উল্লেখ করেছে, এবং এটাতো অস্বীকারের উপায় নাই যে, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মাবলম্বী! অনেকেই বলেন, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী ছিলেন পূর্বে এবং যা পরে হিন্দু ধর্মে লীন হয়ে গেছে, সেই হিসেবে তাকে হিন্দু বললে কি ভুল বলা হবে? একজন হিন্দুকে হিন্দু বলাতে অপরাধ কি? হয়তোবা এখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বাক্যটাকে বেশ নিরীহ মনে হতে পারে, কিন্তু এখানে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনতে হবে। যে পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে সেখানে আসলে কিসের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে? শুধুই কি একটা মানুষের ধর্মীয় পরিচয় দেয়া হচ্ছে, নাকি একটা বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দিকে বিদ্বেষের তীর ছোঁড়া হচ্ছে? ঠিক এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে বলা যায়, লিফলেটের বয়ানে কিংবা শান্তি কমিটির মিছিলে উচ্চারিত আল্লাহু আকবর কিংবা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর কিংবা দুনিয়ার মুসলিম এক হও ইত্যাদি লাইনগুলো যতটা নিরীহ বলে মনে হচ্ছে, কার্যত ততটা নিরীহ ছিল না।

এছাড়া, তখনকার রাজাকার আলবদর নেতাদেরকে ঘন ঘন ভারতের বিপক্ষে কথা বলতে দেখা যায়; তাহলে কি ভারতের সমালোচনা করা যাবে না? মনে রাখতে হবে, ভারত বিরোধিতা এবং ভারত বিদ্বেষ এক জিনিস নয়। আমরা যখন ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলি তখন সে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপের সমালোচনা করি। কিন্তু পাকিস্তানি ও তাদের দোসদের বক্তৃতা বিবৃতিতে যা পাওয়া যায় সেটা স্পষ্টত ভারত বিরোধিতার নামে ভারতীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানো, আরো স্পষ্ট করে বললে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো।

উল্লেখ্য, জামায়াতের নেতাকর্মী কিংবা এরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, আল্লাহর পক্ষে বলা যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তাহলে আল্লাহই সাম্প্রদায়িক! মূলত, এই কথার মাধ্যমেই বোঝা যায় যে, তারা কিভাবে ধর্মনিষ্ঠার সাথে সাম্প্রদায়িকতাকে জড়িয়ে ফেলে। তাদের রাজনীতিটার মুল কৌশলটাই এখানে।

এই পর্বে আমরা দেখবো তারা যে ইসলামের কথা বলে জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে সেই ইসলাম আসলে কি বলে? মূলত ১৯৭১ এ পাকিস্তানি ও তাদের দোসররা যে ইসলামের কথা বলেছে সেটা যে আসলে মূল ইসলাম থেকে কতটা দূরে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং সেই সাথে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহারের দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত নিজামীর রায় থেকে সবচেয়ে বড় সাহায্য নেয়া হয়েছে লেখাটা সাজাতে।

মূল পর্বঃ

একথা সর্বজনবিদিত, ১৯৪১ সালে মাওলানা আবুল আলা মওদুদী জামায়াতে ইসলামী দলটা গঠন করেন। মওদুদীর লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার আদর্শেই ৪৭ এর ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন জামায়াত ই তালেবা (ইসলামী ছাত্র সংঘ) গঠিত হয়। দেশ ভাগের সময় শুরুতে এই দলটা পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা করেছিল কিন্তু যখনই দ্বিজাতিতত্ত্ব সফলকাম হয়, জামায়াতিরা ক্ষমতার লোভে তখন মুসলিম লীগের সদস্যদের সাথে ধীরে ধীরে গড়ে তুলে গড়ে তুলে গভীর ঘনিষ্ঠতা এবং নিজেদেরকে ইসলামী আন্দোলনের রক্ষক হিসেবে পরিচয় দেয়। পাকিস্তান গঠিত হয়েছে মুসলিমদের আবাসভূমি হিসেবে - এই ধারণাটুকু মুসলিমলীগ নেতাদের চিন্তা, চেতনা এবং কার্যকলাপকে করে তুলে সম্পূর্ণ সাম্প্রাদায়িক। অবশ্য এই সাম্প্রদায়িকতাটুকু দ্বিজাতি তত্ত্বেরই ফসল।

জামায়াত ই- ইসলামী এবং মুসলিম লীগের নেতারা তাদের সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধির কাজে প্রথম থেকেই শুরু করে ধর্মের ব্যবহার। তাদের কর্মপন্থাতে তারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত যে, তারা পাকিস্তানকে শুধুমাত্র মুসলিমদের আবাসভূমি গড়ে তোলার জন্যে নিবেদিত প্রাণ। আগের পর্বগুলো জুড়ে এর প্রচুর উদাহরণ দেয়া আছে।

নিজামী আগস্ট মাসে তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, পাকিস্তান আল্লাহর ঘর। আল্লাহ একে বারবার রক্ষা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বলেছেন দুষ্কৃতিকারী। কিন্তু পবিত্র কোরআনের সূরা হজ্জ এর ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ পবিত্র কাবা শরীফকে একমাত্র আল্লাহর ঘর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিজামী এই আয়াত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি ছাত্র সংঘের ছাত্রদের কাছে এবং নিরীহ সাধারণ মানুষদের মধ্যে এমন ভুল কথা ছড়াচ্ছিলেন যেন তাদের কাছে মুক্তিকামী বাঙালিরা আল্লাহর দুশমন হিসেবেই উপস্থাপিত হয়।

গোলাম আযম একাত্তরে রাজশাহীতে এক সেমিনারে বলেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই যে হিন্দুরা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে। তার এই বক্তৃতায় উজ্জীবিত হয়ে তার শিষ্যরাই পুরো একাত্তর জুড়ে হিন্দুদের ওপর চালিয়েছিল ভয়াবহ তাণ্ডব। গোলাম আযম পাকিস্তান ও ইসলামকে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ দাবি করে বক্তৃতায় তুলে ধরতেন। এ দাবিটা তখনকার দৈনিক পত্রিকা থেকে শুরু করে প্রতিটা পাকিস্তানিই করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান ছিল একটা দেশ যার জন্ম হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। অপর পক্ষে ইসলামকে আমরা জানি খোদা প্রদত্ত এক ধর্ম হিসেবে যা প্রচার করেছিলেন হযরত মোহাম্মদ (স) এবং এর ভিত্তি হচ্ছে কোরআন ও হাদিস। পাকিস্তান কখনোই ইসলামের কোন অংশ হতে পারে না বরং এই দাবী করে ইসলামকেই কলুষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হযরত মোহাম্মদ (স) এর তত্ত্বাবধানে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে *মদিনা সনদ* চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল সেই চৌদ্দশত বছর আগে; খুব সম্ভব এটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। বলা হয়ে থাকে যে, মদিনার সনদ আইনের চোখে সবাইকে সমানভাবে দেখার নিশ্চয়তা যেমন দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের একত্রে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা। সনদের ২৯ নং ধারাতে বলা আছে, "বনূ আওফ এর ইহুদিগন মুমিনদের সাথে একই জাতি হিসেবে গণ্য হবেঃ ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম। তারা ও তাদের মিত্রগন অভিন্ন অবস্থানে থাকবে। তবে যে জুলুম করবে এবং অপরাধে লিপ্ত হিবে সে কেবল তাকে ও তার পরিজনদেরই ধ্বংস করবে"।

উপমহাদেশের বিখ্যাত মাওলানা আকরাম খাঁ *মোস্তফা চরিত* বইয়ের মদিনার সনদের দর্শন তুলে ধরেছিলেন এভাবে, 'মদিনা ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীগুলি এখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিনটি স্বতন্ত্র জাতির অবাসভূমি। পরস্পর বিপরীত চিন্তা রুচি ও ধর্মভাব সম্পন্ন ইহুদি, পৌত্তলিক ও মুসলমানদেরকে দেশের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা ও মঙ্গল বিধানের জন্য একই কর্মকেন্দ্রে সমবেত করিতে হইবে, তাহাদিগকে একটি রাজনৈতিক জাতি বা কওমে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে, এক দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় সমূহ, নিজেদের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও, দেশের সেবা কার্যে একত্রে সমবেত হইতে পারে এবং এরূপ হওয়াই কর্তব্য।'

অর্থাৎ, *মদিনা সনদ* অনুযায়ী ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু জামায়াতিরা সর্বদাই এই কাজ করেছে; তাদের সুবিধার্থে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। মদিনার সনদে যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে "বনূ আওফ এর ইহুদিগণ মুমিনদের সাথে একই জাতি হিসেবে গণ্য হবে" সেখানে এসব জানা সত্ত্বেও গোলাম আযম বলেছেন, অন্য ধর্মের সাথে বন্ধুত্ব হতে পারে না। ধর্মকে ব্যবহার করে নিজামী, গোলাম আযমরা একাত্তর পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে নিজেদেরকে ইসলামী পণ্ডিত হিসেবে জাহির করতে সমর্থ হন। তাদের লেখা বিভিন্ন পুস্তকাদি প্রমান করে *মদিনা সনদ* তাদের জ্ঞাত ছিল; কিন্তু আমরা যখন ফিরে যাই ১৯৭১ এর দিকে তখন পুরো ভিন্ন ছবি ভেসে ওঠে আমাদের চোখে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তারা দুষ্কৃতুকারী, বিদ্রোহী ভারতের দালাল, ইসলামের শত্রুই anti state element হিসেবে উল্লেখ করত তাদের বক্তৃতা বিবৃতিতে। "পাকিস্তান আল্লাহর ঘর", "হিন্দুরা মুসলমানদের শত্রু" এবং " ইসলাম ও পাকিস্তান এক ও অবিবিচ্ছেদ্য " এই উক্তিগুলো স্পষ্ট নির্দেশ করে যে ইসলামকে ব্যবহার করে রাজাকার, আলবদরের যুবকদের মগজ ধোলাই দেয়া হয়। কিন্তু ধর্মের এমন রাজনীতিকরণ কিংবা রাজনীতির এমন ধর্মীয়করণ মদিনা সনদের পুরো বিপরীত।

ধর্মান্তরিত করাটাকে রাজাকাররা সওয়াবের চোখে দেখত; জোর করে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বানানোর এমন অনেক নিদর্শনই পাওয়া যায় একাত্তরে পুরো সময়টা জুড়েই। কাজটা তাদের কাছে বিরাট সওয়াবের ছিল। এবার দেখব পবিত্র কোরআনের এ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা:

'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ভুল পথ থেকে'। (সূরা বাকারা: ২৫৬)
'অতএব উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তো একজন উপদেশদাতামাত্র। তুমি ওদের নিয়ন্ত্রক নও'। (সূরা গাশিয়া: ২১-২২)
'তাদের সৎপথে আনার বাধ্যবাকতা তোমার নয় বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন'। (সুরা বাকারা: ২৭২)
'তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে'। (সূরা কাফিরুন: ৬)

এই আয়াতগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন রকম জোর জবরদস্তি, শারীরিক বা মানসিক চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, কোন ধরনের বৈষয়িক লোভ দেখিয়ে কাউকে ধর্মের পথে আনার চেষ্টা করা যাবে না। এটা করা মানে প্রকৃতপক্ষে কোরআনের নীতিমালা ভঙ্গ করার সামিল। এতএব, এটা দেখা যাচ্ছে, জামায়াতী-রাজাকাররা যে ধর্মের নাম ক্ষণে ক্ষণেই মুখে নিত, যে কোরআন হাদিসের নাম নিয়ে যুবকদের অনুপ্রাণিত করত সেটা আসলে ছিল আসল ধর্মের পুরো বিপরীত এবং ইসলামের প্রকৃত নীতিমালা বিরোধী।

পাকিস্তানি ও রাজাকার আলবদররা কিভাবে ধর্মকে ব্যবহার করেছিল তাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে সেটার প্রমাণ আগের তিনটা পর্ব জুড়েই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ধর্মের ধুয়ো তুলে পাকিস্তানি ও তার দোসররা হত্যা করেছিল ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে, ধর্ষণ করেছিল চার পাঁচ লক্ষ বাঙালি নারীকে এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছিল পুরো বাংলাকেই। তাদের ধ্বংসযজ্ঞের নমুনা আমাদের ইতিহাসের বইগুলোতে লিপিবদ্ধ করা আছে বাঙালি মাত্রই এটা পড়া আবশ্যক। প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতার প্রয়োজনেই কিছু নমুনা দিলাম।

তপন বর্ধন-২৫ মার্চ রাতে জগন্নাথ হলের গণহত্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সৌভাগ্যবানদের একজন তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, "...পাক সেনারা বিনা বাধায় ঢুকে যায় হলে। শুরু হল ওদের তাণ্ডব। আমি ঘরে বন্দি থেকে ওদের তান্ডব প্রত্যক্ষ করিনি। তবে ওদের অট্টহাসি ও ছাত্রদের আর্ত চিৎকার সবকিছু আন্দাজ করছি। ওরা রুমে, বাথরুমে, কার্নিশে ছাত্রদের খুজতে থাকে। কোন ছাত্রকে পেয়ে গেলে ওরা পৈশাচিক আনন্দে চিৎকার করতো। 'ওস্তাদ, চিড়িয়া মিল গিয়া'। তারপরেই শুনতে পেতাম অসহায় বন্ধুর তীব্র চিৎকার। এভাবে চলতে থাকে ওদের নরমেধযজ্ঞ ..."।

২৫ মার্চে রাতে পাকিস্তানিরা যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল সেটা খোদ পাকিস্তানি আরেক জল্লাদ নিয়াজীর কাছেও মনে হয়েছিল বিভীষিকাময়। তিনি সেটাকে তুলনা করেছি-লেন চেঙ্গিস খানের ধ্বংসযজ্ঞের সাথে, বলেছিলেন, The military action was a display of stark cruelty, more merciless than the massacre at Bukhara and Baghdad by Changez khan and Halaku khan and at Jalianwala Bagh by British General Dyer.

১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারিতে *দৈনিক পূর্বদেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত বধ্যভূমি শিয়ালবাড়ী প্রতিবেদনটা পাকিস্তানি ও তার দালালদের নির্মমতার সাক্ষ্য বহন করে, "ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে যেখানেই চোখ ফেলেছি-দেখেছি শুধু মানুষের কঙ্কাল। কোথাও পরনের টুকরো কাপড়টা এখনও আছে কোথাও মাথার চুল, গায়ের গেঞ্জি। একটি জিনিসের ব্যাপারে সব কঙ্কালের মিল রয়েছে। তা হচ্ছে রশি বা কাপড় দিয়ে হাত বাঁধা। এখন হাড়ের সাথে রশিগুলো আটকে রয়েছে"



পূর্বদেশ

মীরপুরের উপকণ্ঠে ঝোপ-ঝাড় ও পাতকুয়ায় হাজার হাজার নরকংকাল

বধ্যভূমি শিয়ালবাড়ী

[[দৈনিক পূর্বদেশ: ৭ জানুয়ারি, ১৯৭২]

এবার আসুন দেখা যাক, তাদের এই নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডটাকে ইসলাম কোন চোখে দেখে? পবিত্র কোরআন থেকে উল্লেখ করছি:

'Whoever kills a person [unjustly], except as a punishment for murder or [as a prescribed punishment for spreading] disorder in the land, it is as if he killed all of humanity.' [Surah Al-Ma'idah: verse-32]

"কেউ কাউকে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো"। [সুরা মায়িদা: ৩২]

'And do not kill yourselves (nor kill one another). Surely, Allah is most merciful to you. And whoever commits that through aggression and injustice, we shall cast him in to Fire, and it is easy for Allah.' [Surah An-Nisa: Verse 29 ,30]

"আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙ্গন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য" [সূরা নিসা: ২৯,৩০]

এই দুই আয়াত থেকেই বোঝা যায়, বিচারব্যাথিত যে কোন হত্যা ইসলামে পুরো নিষিদ্ধ- সেখানে ভিকটিমের ধর্ম, বর্ণ, জাত, ভাষা কখনোই বিবেচ্য হতে পারে না। এটা পুরো মানবজাতি হত্যার সমতুল্য। কাফের কিংবা ইসলামের শত্রু আখ্যা দিয়ে হিন্দু কিংবা মুসলমানকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে খোদ ইসলামের দৃষ্টিতেই অবৈধ ও পাপ। এমনকি কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী একজনের দোষের কারণে কখনো আরেকজনকে শাস্তি দেয়া যাবে না, এমনি তার পরিবারকেও না, যে পাপ করেছে শুধু সেই ভোগ করবে তার সাজা।

'And whatever [sin] each soul earns [its evil outcome] falls back upon it. And no bearer of burden will bear another's burden' '[Surah Al-An'am: Verse-164]

"যে ব্যক্তি গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না [সূরা আল আন-আম: ১৬৪]

কোন জাতি কিংবা গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা থাকলেও তাদের প্রতি কোন ধরণের অন্যায় অবিচার করতে সরাসরি নিষেধ দেয়া আছে পবিত্র কোরআনে।

O you who believe! Stand firm for Allah [God],witness in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is closer to righteousness. [Surah-5, Al-Maidah: verse-8]

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রু তার কারণে কখনও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করোনা । সুবিচার করো এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী'

ইসলাম অনুযায়ী, শাসকের শাসনের ও শোষণের জন্যে নিরীহ মানুষকে কোনরূপ শাস্তি দেয়া যাবে না। প্রমাণস্বরূপ, মোহাম্মদ (স) বলেছেন, 'No man amongst them [the peaceful non-Muslim citizens] shall be punished as a penalty for the injustice of a coreligionist'. [Fatwa on Terrorism And Suicide Bombings; Page-106]

সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে যে কোন ধরনের সাহায্য-সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা নৈতিক-সবই নিষিদ্ধ ও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামে। যেমন আবু হুরায়রার মাধ্যমে জানা যায় হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'If any one helps in the murder of a believer-even if with only a few words he will meet Allah with the words written on his forehead: hopeless of Allah's mercy.' [Fatwa on Terrorism And Suicide Bombings –page 65]

"কেউ যদি কোন ইমানদারের খুনিকে সাহায্য করে এমনি খুব ছোট কোন কথার মাধ্যমেও তাহলে

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ড. মুহাম্মদ তাহির উল কাদরী বলেন, This hadith also indicates that it is not only financial and numerical assistance that must be denied to terrorists, but, according to the expression 'bi shatri kalimatin' (a few words), speeches or writings which lend support to the enemies of peace are also condemnable and must be banned. Such support can only deprive us of God's forgiveness and mercy. This hadith contains a strict warning to those who mastermind terrorist acts and misinterpret the Quran by brainwashing youth with glad tidings of Paradise for murdering peaceful civilians.

অর্থাৎ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যে কোন ধরণের সাহায্য করাতেও যেমন নিষেধাজ্ঞা আছে ইসলামে তেমনি bi shatri kalimatin' (a few words) দ্বারা নিষেধ করে দেয়া হয়েছে লিখিত কিংবা মৌখিক যে কোন ধরণের সমর্থন করাটাকেও। এ ধরণের অনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য করে তুলে। এমনকি, স্বর্গের সুখ শান্তির কথা বলে যুবকদের মগজধোলাই করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে নিষেধ করে স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (স) বলেছেন, 'He who raises arms against us in not from us.' [Fatwa on Terrorism And Suicide Bombings; Page-211] *"যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে আসে আমাদের গোত্রের না"* ।

ইসলাম মতে, নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্য সকল ধর্মের লোকদের সবধরণের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের। অন্য ধর্মের লোকের বিরুদ্ধে কখনোই অনৈতিক কিংবা সন্ত্রাসমূলক কাজ করা যাবে না। হযরত মোহাম্মদ (স) একদিকে যেমন নিজেদের [মুসলমান] বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে নিষেধ করেছেন সেই সাথে তিনি নিষেধ করেছেন ভিন্ন ধর্মালম্বীদেরকে কোন ধরনের আঘাত করতে; যে আঘাত করবে তিনি নিজে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, এমনকি শেষ বিচারের দিনও।

Whoever hurts a non-Muslim citizen, I shall be his opponent. And when I am someone's adversary, I shall overcome him on the Day of Resurrection'. [Fatwa on Terrorism And Suicide Bombings; Page-113]

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে পাকিস্তানি শাসক থেকে শুরু করে নিজামী, মুজাহিদ, গোলাম আযম, মওদুদী সবাই যে ধর্মের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন পুরো একাত্তর জুড়ে এবং যে ইসলামী জোশে বারে বারে ডাক দিচ্ছিলেন জেহাদের সেটা ইসলামের প্রকৃত ভাষ্য থেকে আলোকবর্ষ দূরে। তারা ইচ্ছা করেই ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে দিকভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সে সময়কার সাধারণ মুসলমানদের, বিশেষ করে যুবকদের এবং বেশ সফলও হয়েছিলেন। আমি "ইচ্ছা করেই" বলছি এই কারণে, যে তারা নিজেদেরকে "ইসলামী পণ্ডিত" হিসাবে নিজেদেরকে তুলে ধরেছিলেন পরবর্তীতে, এবং তাদের লেখা পুস্তক থেকে জানা যায় যে তারা এ বিষয়ে পুরোপুরি

জ্ঞাত ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী ও তাদের পত্রিকা এ দেশে ধর্মের ব্যবহার সবচেয়ে নোংরাভাবে করেছে এই হচ্ছে এর প্রমাণ।

রাজাকার আলবদরদের সংগঠন জামায়াতে ইসলামী নিজেদেরকে ইসলামী দল হিসেবে জাহির করতে চায় সবসময়; একাত্তরের তাদের ভূমিকা নিয়ে এবার কিছু এ দেশেরই কিছু ইসলামী পণ্ডিত ও আলেম সমাজের কথা শোনা যাক।

বায়তুল মোকাররমে খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক বিচিত্রার সাথে এক সাক্ষাৎকারে একাত্তরে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে বলেন, 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোন জিহাদ হতে পারে না। বরং এটা গুপ্তহত্যা, মানবতা বিরোধী কাজ। ইসলাম মানবতা বিরোধী কাজ কখনও সমর্থন করে না'।

মাওলানা ফজলুল হক আমিনী বলেন, এটা ছিল জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। যারা ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলেছিল তারা ভুল বলেছিল। --- জামায়াতের বিরোধীতা মানে ইসলামের বিরোধী-তা এটাও ঠিক নয়।

মাওলানা ইসহাক ওবাইদী একাত্তরে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে বলেছিলেন, '৭১ সালে জামাত সবচেয়ে বড় ভুলটি করে বসে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে তারা ইসলাম ও কুফরের লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করে। আমরা মনে করি রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেই কোন মুসলমানকে সে আওয়ামী লীগ বা কম্যুনিস্ট পার্টির লোকই হোক কাফের ভাবা ঠিক নয়। ৭১ সালে জামাতের কিছু লোকের বিরুদ্ধে গণহত্যা ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে এসব অবশ্যই নাজায়েয'।

শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, যিনি বুখারী শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, জামায়াতে ইসলামকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'স্বার্থান্ধের পক্ষে সব কিছু করাই সম্ভব। শুধুমাত্র দুনিয়ার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হীন মানসে তারা ইসলামের মুল ভিত্তিকে কুঠারাঘাত করে নড়বড়ে করে দিয়েছে দ্বীনের সৌধকে। পরিতাপ এই জন্য যে, এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে ইসলামকেই। নিঃসন্দেহে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী, তারা বাতিল। শুধরে নেবার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। মিথ্যার বেসাতি করতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ অসত্যের উপর অবস্থান নিয়েছে। বাতিলের উপর জঘন্য দৃঢ়তা'। [Source: Maulana Rezaul Haque Chanpuri Vs. Bangladesh Jamaat-e-Islami and others, reported in 66 DLR, page 14, [para 200, 203 and 270].

শেষ কথাঃ

৭১ এ পাকিস্তানি ও তাদের দোসর জামায়াত নেতারা একদিকে ধর্মকে অপব্যাখ্যা দেয়াতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন, আবার অন্যদিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাদের সে ধর্মীয় অপপ্রচারের জবাব দেয়া হচ্ছিল ক্রমাগতভাবে। উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এমন না যে শুধু ইসলাম ধর্মের বাণীই প্রচার করা হত, বরং অন্যান্য ধর্মের বাণীও প্রচার করা হত সমানতালে। আমরা আপাতত বিষয়ের খাতিরেই অন্যান্য ধর্মের দিকে নজর না দিয়ে শুধু পাকিস্তানিদের অপ্রচারগুলোর জবাবগুলোর দিকে তাকাবো।

একাত্তরের জুলাই মাসে *ইসলামের দৃষ্টিতে* শিরোনামে যে বাণী প্রচারিত হয় সেটা ছিল এককথায় অনবদ্য; লেখক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান।

"মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন অথবা যে স্বভাবেরই হোক না কেন, আল্লাহতায়ালা কতগুলো বিষয় থেকে তাকে কখনো বঞ্চিত করেন না। একজন মানুষ অবিশ্বাসী হতে পারে, নাস্তিক বা কাফের হতে পারে, অথবা আল্লাহর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে পারে, কিন্তু তবুও মানুষ হিসেবে তার কতগুলো অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। সেসব অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোরই নেই। এ অধিকারগুলো হচ্ছে-আলোর অধিকার, বাতাসের অধিকার, পানির অধিকার এবং মৃত্তিকা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই।

আল্লাহতায়ালা চরমতম পাপীকেও এ সমস্ত অধিকার থেকে মাহরুম করেননি। সুতরাং যেখানে আল্লাহতায়ালা শাশ্বতরূপে কতগুলো অধিকারের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত রেখেছেন সেখানে পৃথিবীর কোন প্রচল শক্তিরই অধিকার নেই সেই কল্যাণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার। যখন মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে আল্লাহর নাফরমান হয়ে এসমস্ত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে চায়, তখন সে মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ পাপী বলে চিহ্নিত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে যে নৃশংস অন্যায় লীলা চলছে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী এবং আল্লাহতায়ালার শাশ্বত ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাদের ঘরসংসার, কৃষিজীবন এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে জীবনযাপন করছিল- সে সমস্ত মানুষকে তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পথে যারা বের করেছিল তারা সম্পুর্ণভাবে ইসলামবিরোধী। যে মানুষ ক্ষুদ্র এক মাটির ওপর ঘর বানিয়ে সংসার যাপন করেছে, যে মানুষ উৎসবে-আনন্দে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক নির্লিপ্ত হচ্ছে সেসব মানুষকে তাদের সকল প্রকার সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা শুধু যে মানবিক বিচারে অন্যায় তাই নয়, এটি জঘন্যতম পাপাচার এবং ইসলামের মর্মমূলে প্রচণ্ড আঘাত। কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহতায়ালা ফলবান বৃক্ষের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নদী এবং সমুদ্রের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বাতাস এবং মৃত্তিকার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতায়ালার মানুষকে এই চারটি সম্পদের মধ্যে প্রকাশিত দেখতে চান।

অর্থাৎ কোন মানুষ খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাবেনা, পানির অভাবে পিপাসার্ত থাকবেনা, বাতাসের অভাবে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবে না এবং মৃত্তিকার অভাবে গৃহহারা হবে না। সুতরাং, যে সমস্ত লোক বাংলাদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, বঞ্চনা এবং হত্যাকাণ্ডে সময়কে কলুষিত করছে, তারা ইসলামের নাম মুখে উচচারণ করলেও পৃথিবীতে তারাই একমাত্র ইসলামবিরোধী। সুতরাং আল্লাহর লানৎ তাদের ওপর একদিন না একদিন পড়বেই। যারা নিস্পাপ, নিরপরাধ-যারা শুধু বাঁচার

অধিকারের কথা ঘোষণা করতে চাচ্ছে তাঁদের জয় একদিন হবেই। বাংলাদেশের মুসলমান অত্যন্ত নিগুঢ়ভাবে ধর্মবিশ্বাসী এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। এ সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যারা অন্যায়ভাবে মরণাস্ত্র ধারণ করেছে, আমি ইসলামের নামে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিশাপ ঘোষণা করছি। আমাদের জয় হবেই, আমাদের জয় অপরিহার্য"।

আগেই প্রমাণিত হয়েছে এবং পাকিস্তানিরাই স্বীকার করেছে বাঙালি নারীদেরকে তারা ধর্ষণ করেছিল পরবর্তী প্রজন্মকে সাচ্চা মুসলমান ও পাকিস্তানি বানানোর উদ্দেশ্যে; কিন্তু যে ইসলামের অনুসারী বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে সে ইসলাম তাদের কার্যকলাপকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে *ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ* শিরোনামে প্রচারিত অন্য এক বার্তায় পাকিস্তানিদের হত্যা ও ধর্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত বিশ্লেষণ করে বলা হয়, পাকিস্তানিরা যে পাশবিকতা ও অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের জেহাদ চালিয়ে যাওয়া উচিত। এটা লিখেছিলেন আবু রাহাত মোঃ হাবিবুর রাহমান। সেখানে নারী ধর্ষণের বিষয়ে বলা হয়েছে,

"সুতরাং চিন্তা করুন ওরা ইসলামের নাম ভাঙিয়ে বাংলাদেশে যেভাবে অন্যের অধিকার নষ্টের কাজে লিপ্ত রয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে তারা কত বড় অপরাধী! নারীদের উপর বলাৎকার করা ইসলামের কঠোর ভাষায় নিষেধ আছে। ...সুতরাং পাক হানাদার পশুরা যেভাবে বাংলাদেশে নারীধর্ষণ চালাচ্ছে,তাদেরকে আমরা ইসলামের নামে সংহতির ধ্বজাধারী মুসলমান বলে মেনে নিতে পারিনা। তারা হল মুসলমান নামধারী বেঈমান ও মুনাফেক। অতঃএব, এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং সার্বিক অসহযোগিতা প্রদান করে ওদের বেঈমানির সমুচিত জবাব দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের ইসলামিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা যদি আমাদের এই দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করি, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে আমরাও ওদের সম-অপরাধী বলে গণ্য হব। কারণ ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে প্রতিটি বিশ্বমানবকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদের অর্থ শুধু অস্ত্রধারণ করে জেহাদই ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক সাহায্য প্রদান, অন্যায়কারী ও তাদের সহযোগীদের সাথে সার্বিকভাবে অসহযোগিতা করা, এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারীদের নানাভাবে সাহায্য প্রদান করা, এর বিরুদ্ধে মানুষকে বুঝিয়ে গণসমর্থন গড়ে তোলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের বিজয়ের উপর দৃঢ়বিশ্বাস ও আশা পোষণ করা এবং পুরোপুরি ধৈর্য সহকারে সৎ ও ন্যায়নীতির মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উজ্জ্বল ও স্বর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখাও ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত"।

উল্লেখ্য, ধর্মকে যে ইতিবাচক উপায়েও ব্যবহার করা যায় এরও অগণিত নমুনা পাওয়া যায় একাত্তরে; অবশ্য সেটা বাংলাদেশ শিবিরের মধ্যে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উপরোক্ত দুই কথক সে কথারই প্রমাণ দেয়। একাত্তরে কলকাতায় দূর্গা পূজার দূর্গা প্রতিমার রূপ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। দূর্গার আসনে ইন্দিরা গান্ধী, কার্তিকের আসনে শেখ মুজিব আর অসুরের স্থানে ইয়াহিয়া খানের মূর্তি তৈরি করে কলকাতার হিন্দু বাঙালিরা তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দূর্গা পূজা উদযাপন করেছিল। ধর্মীয় অনুভূতিকে সেদিন ছাপিয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবোধের দুর্বার চেতনা। ধর্মের মাধ্যমেই কলকাতাবাসীরা একাত্মতা ঘোষণা করেছিল বাঙালিদের

সাথে।

Victory belongs to those who fight for a right cause বাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করে নয় মাসের রক্তগঙ্গা পার করে স্বাধীনতার সূর্যটাকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বাংলা স্বাধীন হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা হয়েছিল বাংলার অন্যতম স্তম্ভ। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণে পরবর্তীতে আবারো এই বাংলা প্রত্যক্ষ করে পাকিস্তানি নমুনা। জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীবৃন্দ ও ঘৃণিত দালালরা আবারো ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সক্রিয় হওয়া শুরু করে। ধর্মকে ব্যবহারের এই যে শিক্ষা পাকিস্তান আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তারপর গত হতে চলেছে অর্ধশতাব্দী; তবু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করাটা আমরা ভুলতে পারি নাই।

তথ্যসূত্রঃ

১) Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings – Dr. Tahir Ul Qadri

২) The Chief Prosecutor versus Motiur Rahman Nizami ICT-BD Case No.03 OF 2011

৩) বাঙ্গালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তনধারা- আহমদ শরীফ

৪) দৈনিক পূর্ব দেশ (ডিসেম্বর, ১৯৭১)

৫)একাত্তরের রণাঙ্গন অকথিত কিছু কথা- নজরুল ইসলাম

৬) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র

৭) সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২

৮) মদীনা সনদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩

৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যাঃ ১৯৭১, জগন্নাথ হল- রতনলাল চক্রবর্তী

১০) ধর্ম রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা- বদরুদ্দীন উমর

গবেষকদের কাছে ম্যাসাকার, গণহত্যা, পলিটিসাইড শব্দগুলো মূলত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক এই হত্যাযজ্ঞকে কি তাহলে গণহত্যা বলা যায়? "পাকিস্তানীদের আক্রমণে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি প্রাণ হারিয়েছে বটে তবে সেটা গণহত্যা নয়! তখন যুদ্ধ চলছিল দেশব্যাপী, যুদ্ধের সময় এমন প্রাণহানি হবেই" গণহত্যা অস্বীকারকারীদের যুক্তিগুলো অনেকটা এ ধরণের। এই যুক্তিকে ঘিরেই মূল আলোচনা। বিশেষজ্ঞরা গণহত্যার বিভিন্ন ধাপ নিয়ে প্রচুর একাডেমিক আলোচনা করেছেন।

১৯৯৬ সালে প্রখ্যাত গবেষক Dr. Gregory H. Stanton একটা আর্টিকেল লিখেন "stages of genocide নামে; যেখানে তিনি একটি গণহত্যা সংগঠনের বিভিন্ন ধাপ নিয়ে বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর কাজের ওপর ভিত্তি করে আমাদের উপর সংগঠিত গণহত্যাটিকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমত, গণহত্যা বা Genocide বলতে আমরা কি বুঝি? Genocide এর উৎপত্তি গ্রীক শব্দ geno এবং ল্যাটিন শব্দ caedere থেকে। geno এর অর্থ জাতি বা গোষ্ঠী এবং caedere এর অর্থ হত্যা করা; অর্থাৎ সংক্ষেপে দাঁড়ায়, "Genocide is the systematic elimination of all or a significant part of a racial, ethnic, religious, culture or national group"। আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী, গণহত্যা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন একটা গোষ্ঠীকে (National, ethnical, racial or religious) পুরোপরি কিংবা আংশিক ধ্বংসের উদ্দেশ্যে চালিত অপরাধসমূহ -

১) গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা

২) গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করা

৩) ইচ্ছাকৃত ভাবে হানা দিয়ে গোষ্ঠীর প্রকৃত অবস্থা পুরোপুরি কিংবা আংশিক ধ্বংস করা

৪) আইন প্রণয়ন করে গোষ্ঠীর ভেতর জন্মরহিত করণ চালু করা

৫) জোরপূর্বকভাবে গোষ্ঠীর শিশুদেরকে অন্য গোষ্ঠীতে ঢুকিয়ে দেয়া

উপরের সংজ্ঞাগুলোতেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোন গোষ্ঠীর মানুষদের হত্যা করলেই যে শুধু গণহত্যা তা নয়, বরং এর পাশাপাশি সদস্যদের যে কোন মানসিক ও শারীরিক ক্ষতিসাধনও এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নির্দিষ্ট কোন গ্রুপকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এর শিশুদেরকে অন্য গোষ্ঠীতে ঢুকিয়ে দেয়া কিংবা সেখানে জোর করে জন্মদানে বাধা দেওয়াও গণহত্যার সামিল। প্রধান

আলোচনায় যাওয়ার আগে জেনে নেয়া যাক কারা কিংবা কোন অপরাধগুলো গণহত্যার সাথে সম্পর্কিত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ-

১) গণহত্যায় সরাসরি অংশগ্রহণ করা

২) গণহত্যার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করা

৩) প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উস্কানি দেয়া যা গণহত্যার পথ সুগম করে

৪) গণহত্যার চেষ্টা করা

৫) গণহত্যায় সহায়তা করা।

Gregory H. Stanton তার আর্টিকেলে গণহত্যা সংগঠনের প্রক্রিয়াকে ৮ টা ধাপে কিংবা পর্যায়ে ভাগ করেছেন। ধাপগুলো নিম্নরূপঃ
1.Classification, 2.Symbolization, 3.Dehumanization, 4.Organisation, 5.Polarization, 6.Preparation, 7. Extermination, 8.Denial.

প্রথম দুটি পর্যায় প্রতিটা সমাজেই প্রতীয়মান; Classification কিংবা শ্রেণিকরণ ধর্মের ভিন্নতা, ধর্মের ভেতরে মতাদর্শের ভিন্নতা, মুখের ভাষার ভিন্নতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্রতাসহ আরো অনেক কারণেই হয়ে থাকে। আবার প্রতিটা শ্রেণিকে চিহ্নিত করা হয় ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বারা, যাকে লেখক বলেছেন Symbolization। দাড়ি টুপি যেমন মুসলিমদের পরিচয় বহন করে তেমনি ধুতি সিঁদুর বহন করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পরিচয়। সেই চিহ্নিতকরণ কখনো কখনো করা হয় গাত্রবর্ণের দ্বারা, কখনো শারীরিক গঠন দ্বারা; যেমন, উপজাতি। সামনেই আমরা দেখতে পাব এই Symbolization কিভাবে গণহত্যায় সহায়তা করে।

লেখকের মতে, প্রথম দুটি পর্যায় প্রতিটা সমাজেরই অংশ এবং তা সর্বত্র বিদ্যমান থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই দুটোর সাথে যখন একত্র হয় Dehumanization, তখনই প্রথম দুটো পর্যায় “গণহত্যার” সাথে সম্পর্কিত হয়ে উঠে। এটা অনস্বীকার্য, অন্যের মনুষ্যত্বকে অস্বীকারই উদ্দীপনা যোগায় একের পর এক দায়হীন হত্যার। প্রতিটি গণহত্যাতেই দেখা যায় ভিকটিমদেরকে শুরুতেই বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের সাথে তুলনা করা হয় যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই Dehumanization এর প্রথম পর্যায়। কখনো কখনো ভিকটিমদেরকে “Disease” “Virus” কিংবা “Cancer” হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। নাৎসিরা ইহুদিদেরকে প্রকাশ্যেই “Rat” অথবা “Vermin” বলে সম্বোধন করত। রুয়ান্ডায় হুতুরা তুতসীদেরকে “Cockroach” বলে ডাকত। মনুষ্যত্বের প্রতি তাদের সর্বোচ্চ অবজ্ঞা কিংবা ঘৃণার প্রকাশ পাওয়া যায় গণহত্যার সময় আক্রান্তদেরকে হত্যার পর তাদের অঙ্গহানি করা, কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা কিংবা সীমাহীন নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করার মধ্য দিয়ে।

এবার এই ধাপটাকে আমরা মিলিয়ে দেখি ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহের সাথে। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক A Witness to Surrender” বইতে লিখেছিলেন,

আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবোধের "Virus" ছড়াচ্ছিল যা বাঙালি সাধারণ মানুষ ও সেনাদের "Infect" করছিল। খেয়াল করে দেখুন শব্দ দুটো, virus এবং infect! আওয়ামী লীগ কর্মীরা ছিলেন তাদের কাছে "গুণ্ডা"। কারো কারো কাছে তো পুরো বাঙালি সমাজটাই ছিল "বাস্টার্ড" এবং "জারজ"। বাঙালিদেরকে উদ্দেশ্য করে কসাই টিক্কা খান বলেছিলেন, Reduce the number of Bengali bastards"। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের দিকে এক নৈশভোজের জেনারেল ইয়াহিয়া বলেছিলেন, Don't worry We will not allow these black bastards to rule over us.

মার্চে যখন শেখ মুজিবের সাথে ইয়াহিয়ার আলাপ আলোচনা চলছে তখনকার ঘটনা; প্রথমদিন আলোচনার পরই ইয়াহিয়া একটু বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিলেন দেখে সিদ্দিক সালিকের মন্তব্যটা শুনুন, Amazingly, he had (apparently) failed to see the snake in the grass"। এ বিষয়ে গবেষক মুনতাসীর মামুন লিখেন, "রূপক অর্থে হয়তো এটি ব্যবহৃত কিন্তুসাপ বলতে তো বাঙালিকেই বোঝাচ্ছে"।

এরপরই আসে পরবর্তী পর্যায়, Organization। পৃথিবীর সবগুলো গণহত্যাই চালানো হয়েছে দলবদ্ধভাবে সংঘটিত হয়ে, অবশ্য বেশিরভাগই হয়েছে সরকারীভাবে কিংবা মিলিটারী দ্বারা। হত্যা করার জন্যে নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার দরকার পড়ে না কিংবা প্রতিপক্ষকে মারার জন্যে কোন জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে যাওয়ার দরকার পড়ে না, যেমন রুয়ান্ডায় তুতসীরা মারা গিয়েছিল ছোরাঘাতে, কম্বোডিয়ায় গণহত্যা চালানো হয়েছিল নিড়ানির মত একধরনের ছুরি দিয়ে। কম্বোডিয়ার গণহত্যাকারীদের নীতি ছিল Bullets must not be wasted" যা কিনা ভিকটিমদের প্রতি ছিল সর্বোচ্চ Dehumanization। কখনো কখনো ফায়ারিং স্কোয়াড কিংবা ক্যাম্প স্থাপন করেও ম্যাসাকার চালানো হয়। এই Organization এ ভিন্নতা দেখা দেয় সমাজ থেকে সমাজে, দেশ থেকে দেশে; তবে এটা সর্বদা সুসংগঠিত অবস্থায়ই হয়ে থাকে। ৭১ এ পাকিস্তানি সরকার এবং মিলিটারির পাশাপাশি সংগঠনে অংশ নিয়েছিল দেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তিসেনা প্রভৃতি দল। এসব দেশিয় দলগুলোতে ঢুকতে হলেও ফরম পূরণ করা আবশ্যক ছিল।

এরপরই আসে Polarization এবং Preparation পর্যায়। প্রতিটা গণহত্যার শুরুতেই উগ্রপন্থীরা মঞ্চ থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে সকল "মডারেট" দের যারা গণহত্যার গতি কমিয়ে দিতে পারে, যাকে লেখক বলেছেন Polarization। উগ্রপন্থীরা তাই টার্গেট করে সকল মডারেট নেতাদের এবং তাদের পরিবারকে। আমরা জানি যে, ফেব্রুয়ারির থেকে দশ মার্চ এর মধ্যে তিনবার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বদলি করা হয়। কারণ, এরা ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপারগ ছিলেন।

এর মধ্যে জেনারেল ইয়াকুব বিবেকের তাড়নায় নাকি পদত্যাগ করেছিলেন; পাকিস্তানি ভাইদের উপর তিনি গুলি চালাতে পারবেন না। পাকিস্তানের অনেক বিবেকবান মানুষই তখন পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বাঙালিদের; প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেল খেটেছেন, নিগৃহীত হয়েছেন ইয়াহিয়ার আমলে। (শাহরিয়ার কবিরের "যুদ্ধাপরাধ ৭১" নামক ডকুমেন্টারি দেখতে পারেন)

Preparation কিংবা প্রস্তুতিরই একটা অংশ হচ্ছে Identification। লেখকের মতে, "Identification greatly speeds the slaughter"। ভিকটিমদের তালিকা তৈরি করা হয়, বাড়ি ঘর চিহ্নিত করা হয়, ম্যাপ তৈরি করা হয়। রুয়ান্ডায় সবার পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করে হয়েছিল যেন সহজেই তুতসীদের চেনা যায়। এই আইডি কার্ড ছুড়ে ফেলে দিলেও কাজ হত না, হুতু হিসবে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে না পারলে তুতসী বলেই ধরে নেয়া হত। এই পরিচয়ের ক্ষেত্রে Symbolization এর ভূমিকা ব্যাপক। পাকিস্তানিরা ছিল হিন্দু বিদ্বেষী, হিন্দুদের উপর তাই প্রকোপও পড়েছিল বেশী। তাই হিন্দু নারীরা তখন মাথার সিঁদুর মুছে ফেলত, পুরুষরা মাথায় টুপি পরত, ধুতির বদলে লুঙ্গি পরতো। পাকিরা "চার কলেমা"র মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম যাচাই করতো; কেউ বলতে না পারলেই গুলি করে হত্যা করা হত। কখনো কখনো লুঙ্গি খুলে পরীক্ষা করতো হিন্দু না মুসলমান! অবশ্য শুধু হিন্দুরাই নয়, পুরো বাঙালি সমাজই তাদের গণহত্যার শিকার হয়েছিল।

Identification' এর আরেক প্রমাণ হচ্ছে রাও ফরমান আলীর ডায়েরি, যেখানে পাওয়া গিয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকা। তার ডায়রিতেই লেখা ছিল, Green land of East Pakistan will be painted red"।

ভিকটিমদের সম্পত্তি লুটপাট করা কিংবা বাজেয়াপ্ত করা ও প্রস্তুতির অংশ; যার বেশীরভাগই করেছিল পাকিদের এ দেশীয় দোসররা। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করা ও যাতায়াতের জন্যে Transportation ব্যবস্থা করাও গণহত্যার প্রস্তুতির ভেতরে পড়ে। আমরা সকলেই জানি এ দেশের স্কুল, কলেজ, বিমানবন্দর, বিভিন্ন বাড়িকেই পাকিস্তানিরা ক্যাম্প বানিয়েছিল। কখনো কখনো খোলা মাঠে জমা করতো সবাইকে অতঃপর নির্বিচারে হত্যা করা হত সবাইকে।

প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরেই আসে সপ্তম ধাপ, Extermination। এটাকে মার্ডার না বলে Extermination ই বলা হয়, কেননা এ ক্ষেত্রে আক্রান্তদেরকে মানুষ বলে বিবেচনা করা হয় না। পরিকল্পনামাফিক হত্যা করা শুরু হয় প্রতিটা লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে, এমনকি বাচ্চাদেরকেও রেহাই দেয়া হয় না। অপারেশন সার্চলাইট এর কথা সকলেই জানি। পাকি জেনারেলদের বইপত্র প্রমাণ করে যে, অপারেশন সার্চলাইট তাদের বহু দিনের প্ল্যান, হুট-হাট কোন সিদ্ধান্ত নয়। এই Extermination এতটাই ভয়াবহ ছিল যে এক পাকিস্তানি জেনারেলই (নিয়াজি)

এটাকে চেঙ্গিস খানের নিষ্ঠুরতার চেয়ে বেশী ভয়াবহ বলেছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রতিটা Extermination এর শেষে হত্যাকারীরা শোধন প্রক্রিয়া বলে একে ইতিবাচক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। বসনিয়াতে বলা হয়েছিল, ethnic cleansing, আলজেরিয়াতে বলা হয়েছিল Ratonade (Rat extermination)। যেমন পঁচিশ মার্চ রাতের পর ভূট্টো বলেছিলেন, "আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে"।

সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে Denial কিংবা অস্বীকার করা। খেয়াল করে দেখবেন, প্রতিটা গণহত্যাই শেষ হয় প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে। এই প্রত্যাখ্যানের জন্যে অপরাধীরা কয়েকটি নির্দিষ্ট পন্থা বেছে নেয়।

১) গণকবরগুলো লুকিয়ে ফেলা হয়
২) ঐতিহাসিক দলিলগুলো পুড়িয়ে নষ্ট করে ইতিহাসের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়
৩) গণহত্যা সংক্রান্ত সকল রিপোর্টকে বিরোধীদলের প্রোপ্যাগান্ডা হিসেবে অভিহিত করা হয়
৪) গণহত্যার তথ্যগুলো Officially approved সূত্র থেকে আসেনি এই অজুহাতে গণহত্যার সকল রিপোর্টকে Unconfirmed অথবা alleged হিসেবে চিহ্নিত করা হয়
৫) হত্যাগুলো প্রচলিত গণহত্যার সংজ্ঞাকে সংজ্ঞায়িত করে কি না এই নিয়ে কু -তর্ক করা হয়
৬) ভিকটিম দলের হতাহতদের সংখ্যার চেয়ে নিজ দলের হতাহতের সংখ্যা আরো বেশী বলে দাবি করা হয়
৭) মানুষ মারা গিয়েছে "গৃহযুদ্ধ" এর কারণে, তাই এটা গণহত্যা না -বলে দাবি করা হয়।

খুব মনোযোগ দিয়ে ৭ টা পয়েন্ট পড়ে দেখুন তো, এই কথাগুলো আমাদের সাথে খুবই পরিচিত কি না? প্রতিটা যুক্তি কিংবা পন্থাই কি আমাদের উপর চালানো গণহত্যাকে অস্বীকার করতে ব্যবহৃত হয় নি? যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় গণহত্যার সংক্রান্ত সব খবরকেই "ভারতীয়দের চক্রান্ত" হিসেবে উল্লেখ করা হত। ৭১ এর আগস্ট মাসে পাকিস্তানি সরকার একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যেখানে আওয়ামী লীগকেই গণহত্যার জন্যে দায়ী করা হয়। এই শ্বেতপত্র নিয়ে ৬ আগস্ট New York Times প্রতিবেদন ছাপায় Pakistan accuses of Bengalis massacring 100,000" শিরোনামে। খবরে বলা হয়, In a white paper, the government asserted that 100,000 men, women and childern had died since March 1 in a reign of terror unleashed by the Awami league the now banned political party that pressed for autonomy and then

Independence. এই শ্বেতপত্র প্রকৃত ইতিহাস থেকে কতটা দূরে ছিল সেটা সহজেই অনুমেয়। মে মাসের ২৫ তারিখ পাকিস্তানি এক সংবাদপত্র শরণার্থীদের নিয়ে খবর প্রকাশ করে Refugees are victims of Indian propaganda শিরোনামে।


Pakistan rejects allegation

Refugees are victims of Indian propaganda

গণহত্যায় পাকিস্তানিদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের মুখপাত্র "দৈনিক সংগ্রাম" তখন নিয়মিতই মুক্তিযুদ্ধ কিংবা পাকিদের গণহত্যাকে ভারতীয়দের চক্রান্ত বলে প্রচার করেছিল। ৬ মে পত্রিকাটি "শরণার্থী বাহানা" শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে লিখে, "হিন্দুস্থান এখন নিজ দেশের তালাবদ্ধ মিল কারখানার বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও বেকার নাগরিকদের একত্র করে তাদের শরণার্থী বলে প্রচার করছে। এবং বিশ্ববাসীর দরবারে মানবিকতার দোহাই দিয়ে তাদের নামে স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা চালাচ্ছে"। ব্রিটিশ পত্র পত্রিকা তখন গণহত্যার খবর নিয়মিত ছাপানো শুরু করলে এ নিয়ে ৫ জুলাই "দৈনিক সংগ্রাম" খবর প্রকাশ করে; শিরোনাম "হিন্দুস্থানের চক্রান্ত জালে ব্রিটিশ"। মিথ্যে কয় প্রকার ও কি কি সেটা শুধু এই "দৈনিক সংগ্রাম" এর খবরগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

এই পর্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ কিংবা দলিল হচ্ছে পাকিস্তানি জেনারেল-মেজরদের লেখা বইপত্র। সবারই এক কথা, ১৯৭১ এ দেশে কি হচ্ছিল তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, সবই তাদের অগোচরে হয়েছিল। নাৎসি বাহিনীর চারজনের বিচার নিয়ে নির্মিত অস্কার বিজয়ী মুভি "Judgment at Nuremberg "(1961) এ দেখা যায়, যখন আসামীদের কে "ইহুদি গণহত্যা" বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তাদের উত্তরও ছিল অনেকটা "আমরা কিছুই জানতাম না" ধরণের। নাৎসি বাহিনীর সাথে এদের অমিল এক জায়গায় ওদের বিচার হয়েছিল, আর পাকি জেনারেলদের বিচার হয় নি।

যুদ্ধের এতটা বছর পর, এই ২০১৫ সালেও এসে পাকিস্তানিরা অস্বীকার করছে গণহত্যার কথা, বলছে ভিত্তিহীন এসব অভিযোগ। ৩০ নভেম্বর পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গণহত্যার কথা অস্বীকার করে বলা হয়, baseless and unfounded assertions' of Bangladesh against

Pakistan. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার মাধ্যমে পাকিস্তানীদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নাকি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই অভিযোগ করে বাংলাদেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে সে বিজ্ঞপ্তিতে আবার বলা হয়, It is regrettable that attempts have been made by the Government of Bangladesh to malign Pakistan, despite our ardent desire to develop brotherly relations with Bangladesh. Pakistan believes that the peoples of both countries not only want to maintain but also further strengthen the bonds of friendship and brotherhood. However, sadly, the Government of Bangladesh does not seem to respect these sentiments.

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই Denial টা শুধু পাকিস্তানিরাই করেনি বরং এই পাকিস্তানি জেনারেলদের মন মানসিকতার সাথে আমাদের একটা সম্প্রদায়ের মানসিকতার প্রচণ্ড মিল বিদ্যমান। জেনারেলরা যেমন " গণহত্যা"টাকে কোনভাবেই মানতে চান না; সংখ্যাটা খুব বেশী হলে হাজার বিশেক হতে পারে! একজন জেনারেল জগন্নাথ হল এবং ইকবাল হল ঘুরে এসে লিখেছেন, "হল দুটি পরিত্যক্ত, কিন্তু ধ্বংসলীলা তেমন হয় নি"। অথচ আমরা সবাই জানি এখানকার নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা। ঠিক আমাদের মাঝের ঐ সম্প্রদায়ের অবস্থাটা তাই, আগে বলতো ত্রিশ লাখ না আরো কম হবে; এর পরে বলল, আসলে ৩ লক্ষ, ভুল করে ৩০ হয়ে গেছে! সংখ্যাটা শুধু নামছে, কয়দিন পর হয়তোবা বলবে, "১৯৭১ এ আসলে কিছুই হয় নাই...সবই ষড়যন্ত্র...!"

পাকিস্তানি থেকে শুরু করে যারাই এটাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চান না তারা মোটামুটি সকলেই ৭ নম্বর যুক্তিটা দেখান সবসময়। "ইহা একটি গৃহযুদ্ধ; তাই গণহত্যা হতে পারে না"। অথবা এটাও বলেন যে, "যুদ্ধের সময় হতাহতের ঘটনা ঘটবেই তো!" তাদের জন্যে লেখকের পরের দুইটা লাইন সরাসরি তুলে দিচ্ছি, Infact civil war and genocide are not mutually exclusive. Most genocide occur during wars.

এটা স্বীকার করতেই হবে, যে কোন ধরনের অপরাধের পর এর "বিচারহীনতা" কিংবা "দায় থেকে অব্যাহতি" সে ধরনের অপরাধ ভবিষ্যতে সংঘঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলে। এ কথাটা গণহত্যার সাথেও সম্পর্কিত। হিটলার তখন পোল্যান্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল; সে সময় হিটলারের সামনে আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গের প্রসঙ্গ তুললে সে জবাব দেয়, Who ever heard of the extermination of the Armenians!" এটা বুঝতে হবে, যে কোন গণহত্যার একটি ভয়াবহ নেতিবাচক দিক হচ্ছে সেটাকে ভুলে যাওয়া কিংবা দোষীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না পারা যা ইন্ধন যোগায় ভবিষ্যতের আরেক গণহত্যাকে। তাই গণহত্যাকে অস্বীকার করার এই প্রবণতা দূর করার জন্যে লেখক

জোর দিয়েছেন পাবলিক ট্রায়াল ও ট্রুথ কমিশনের উপর; "... public trials and truth commission, followed by the years of education about the fact of genocide"।

যখন আদালত আক্রান্তদেরকে সুবিচার দিতে পারে না তখন তাদের মধ্যে জন্ম নেয় প্রতিশোধ নেয়ার প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষা যা কিনা সমাজে বাড়িয়ে দেয় অপরাধের মাত্রা আরো বহুগুণে এমনকি কখনো কখনো সুগম করে গণহত্যার পথ; In societies with histories of ethnic violence, the cycle of killing will eventually spiral downward into the vortex of genocide। এই আর্টিকেলের শেষ লাইনটাও তাই বিচার প্রসঙ্গ নিয়ে, The strongest antidote to genocide is justice"

গণহত্যা পরবর্তী সময়ে গণহত্যার শিকার হওয়া যে কোন গোষ্ঠীর ওপর সেই রক্তাক্ত ঘটনার কারণেই অনেক ধরণের সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক প্রভাব পড়ে। রুয়ান্ডাতেও গণহত্যার পরবর্তী সময়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা বেঁচে যাওয়াদের অনেক সমস্যার কথা জানা যায়। একাত্তরের পরবর্তীতে এই গণহত্যার কি ধরণের প্রভাব আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি মানসে পড়েছিল সেটাও গবেষণার দাবি রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে হলিউডে এখনো সিনেমা বানানো হয়, সেসব সিনেমা দর্শক নন্দিতও হয়। বিভিন্ন উপায়ে হিটলারের কুকর্মগুলো উপস্থাপন করা হয় এই প্রজন্মের কাছে যেন তারা জানতে পারে আসলে তখন কি হয়েছিল। নাৎসি বাহিনীর প্রতি ঘৃণা নিয়েই তাই বড় হচ্ছে ইউরোপের এই প্রজন্ম। এইতো কয় দিন আগে রাশিয়ান একটা ফুটবল টিমকে শাস্তি দেয়া হয় দলের সমর্থকেরা নাৎসি বাহিনীর চিহ্ন দেখিয়েছিল বলে। রাশিয়ান ফুটবলের অফিসিয়ালরা বলেন, In Nazi Germany, they were used as emblems of the Hitlar Youth. We can't ignore the appearance of these symbols – especially in our country. (7 April , 2015, The Washington Post) অথচ, মুদ্রার ঠিক উল্টো পাশে আমরা। পাকিস্তানকে শুধু সমর্থনই করেই ক্ষান্ত হই না, খেলার মাঠে নিয়ে যাই তাদের জাতীয় পতাকাও। মাত্র ৪৫ বছরের মাথায় আমরা ক্ষমা করে দিয়েছি সকল পাকি গণহত্যাকারীদের, আমার দেশের পতাকা টানিয়ে দিয়েছি এক রাজাকারের গাড়িতে, গণহত্যাকারীদের বুক ফুলিয়ে বলতে দিয়েছি "এই দেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই", শহীদের সংখ্যা নিয়ে কু তর্কে মেতেছি।

"আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ন-নৃত্য দেখি
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে..."
(রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ)

তথ্যসূত্রঃ

১) 8 Stages of Genocide – Dr. Gregory H. Stanton
২) মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র - মুনতাসীর মামুন
৩) পাকিস্তানি জেনারেলদের মন - মুনতাসীর মামুন
৪) Witness to Surrender - Siddiq salik
৫) মুক্তিযুদ্ধের দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা - আলী আকবর টাবী
৬) The New York Times Archive
৭) ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাহুল্য নাকি বাস্তবতা -আরিফ রহমান

সাহায্যকারী গ্রন্থ

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র

২। The Rape of Bangladesh-অ্যান্থনী মাসকারেনহাস

৩। প্রবন্ধ সমগ্র- সরদার ফজলুল করিম

৪। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সামরিকজান্তা ও তার দোসরদের অপতৎপরতা- সুকুমার বিশ্বাস

৫। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস- গোলাম মুরশিদ

৬। মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১- মুনতাসীর মামুন

৭। অসমাপ্ত আত্মজীবনী-শেখ মুজিবুর রহমান

৮। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস-বশীর আল হেলাল

৯। মাওলানা আজাদের সাক্ষাৎকার-ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত

১০। পাকি জেনারেলদের মন-মুনতাসির মামুন

১১। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি- বদরুদ্দীন উমর

১২। ভাষা আন্দোলনে সিলেট- তাজুল মোহাম্মদ

১৩। চল্লিশ থেকে একাত্তর-এম আর আখতার মুকুল

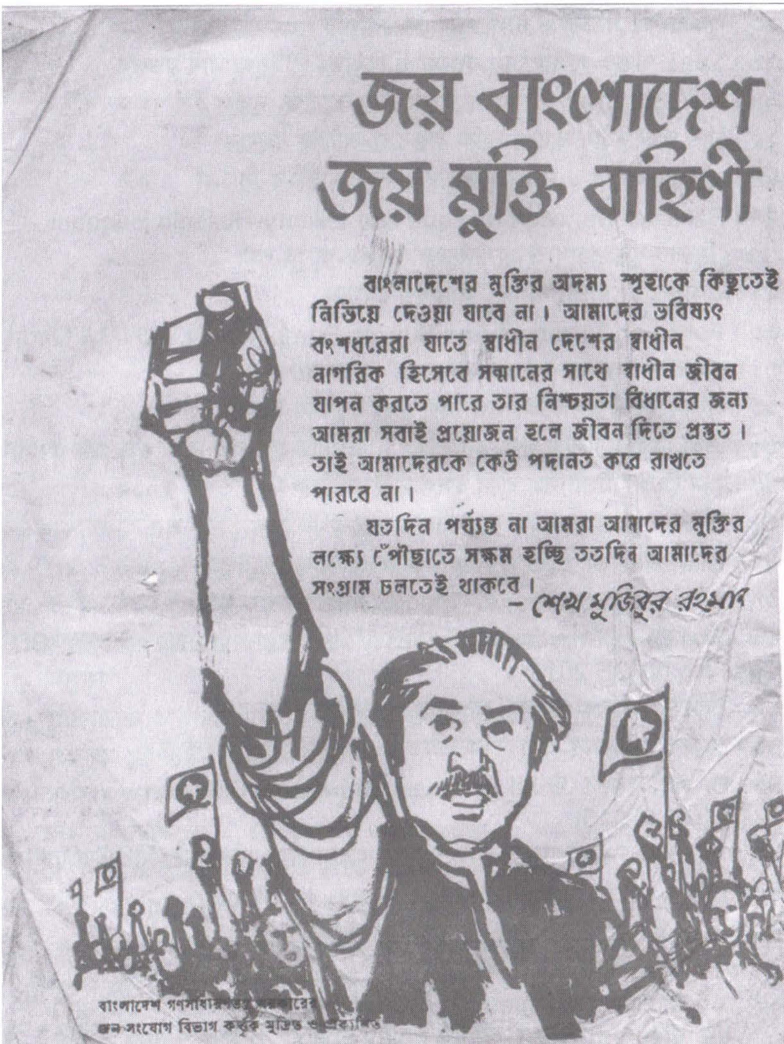
১৪। ধর্ম রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা-বদরুদ্দীন উমর

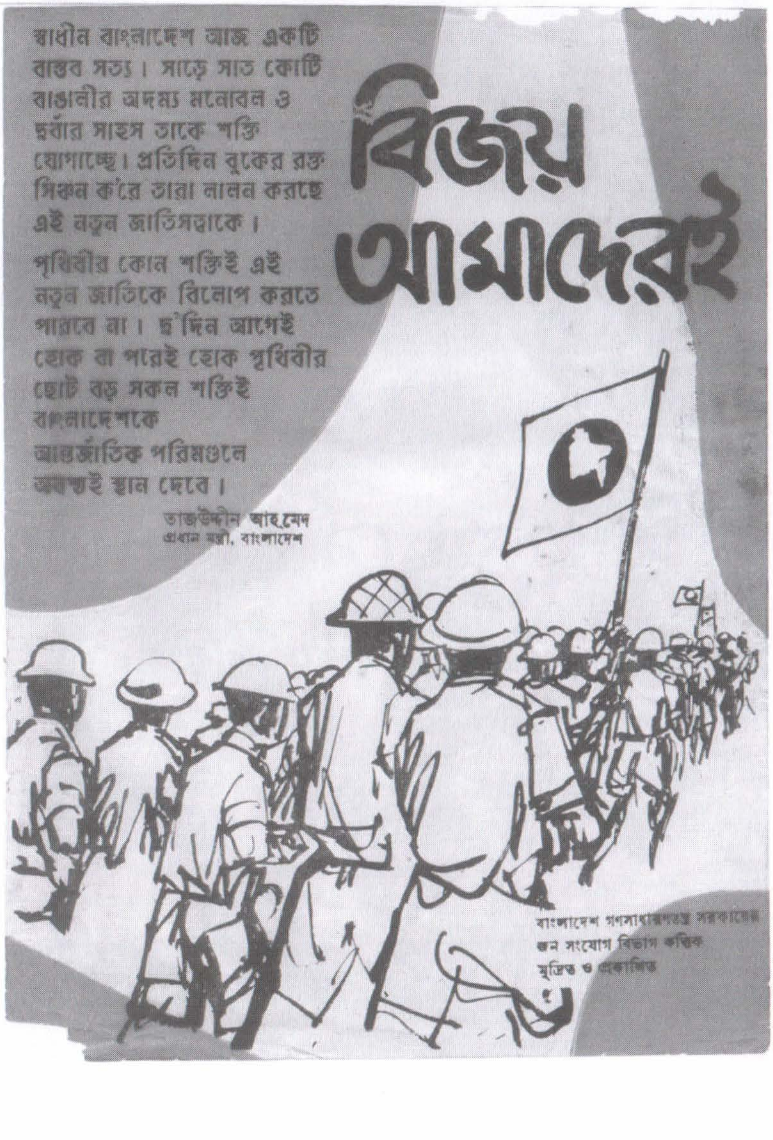
১৫। একাত্তরের দালালনামা- ইফতেখার আমীন

১৬। একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা -আজাদূর রহমান চন্দন

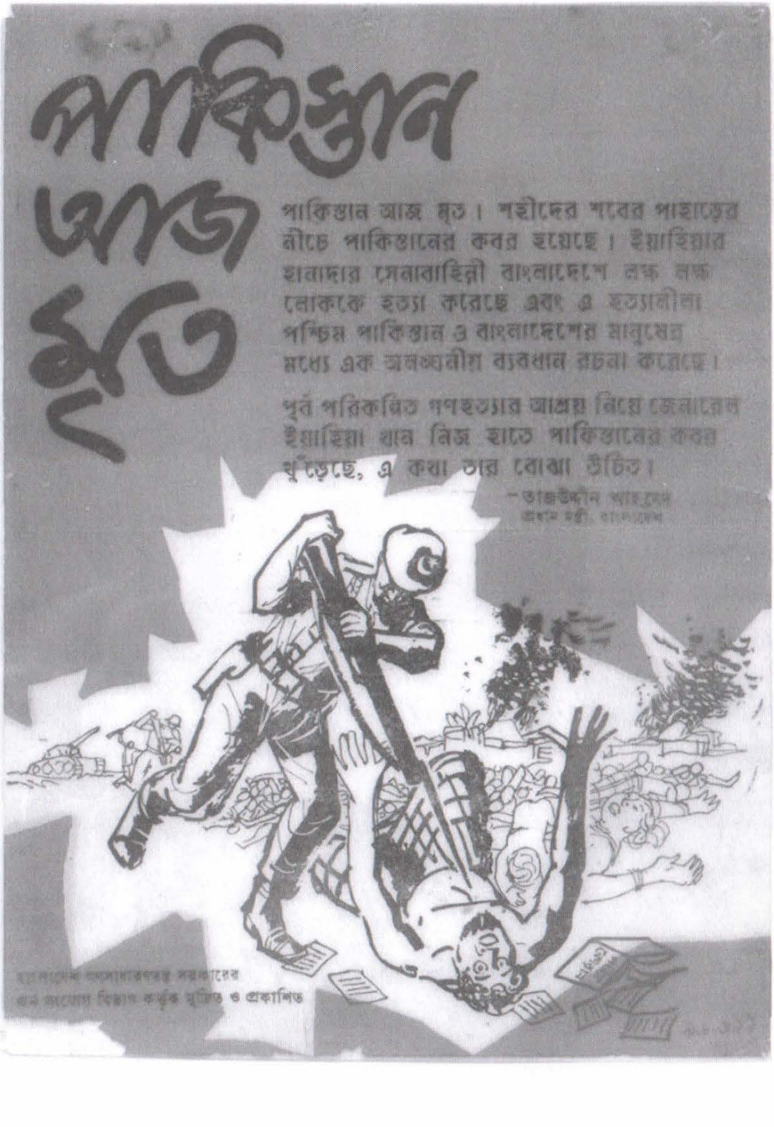
১৭। শান্তি কমিটি ১৯৭১- মুনতাসীর মামুন

১৮। ঘাতকের দিরলিপি- রমেন বিশ্বাস
১৯। রাজাকারের মন- মুনতাসীর মামুন
২০। মুক্তিযুদ্ধের দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা- আলী আকবর টাবী
২১। আলবদর- মুনতাসীর মামুন
২২। একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়
২৩। ১৯৭১ ঘাতক-দালালদের বক্তৃতা ও বিবৃতি- সাইদুজ্জামান রওশন
২৪। একাত্তরের ঘাতক দালাল-যা বলেছে যা করেছে- নুরুল ইসলাম সম্পাদিত
২৫। ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাহুল্য নাকি বাস্তবতা-আরিফ রহমান
২৬। গোলাম আযম ও জামায়াতের রাজনীতি-সাপ্তহিক বিচিত্রা
২৭। Pakistan-Between Mosque and Military-Hussain Haqqani
২৮। সিলেট যুদ্ধাপরাধ ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র-অপূর্ব শর্মা
২৯। একাত্তরের গোপন দলিল- আরিফুর রহমান
৩০। Fatwn on Terrorism And Suicide Bombings-Dr. Tahir Ul Qadri
৩১। বাঙ্গালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তনধারা- আহমদ শরীফ
৩২। একাত্তরের রণাঙ্গন অকথিত কিছু কথা-নজরুল ইসলাম
৩৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যাঃ ১৯৭১, জগন্নাথ হল-রতনলাল চক্রবর্তী
৩৪। সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম-ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০১২
৩৫। মদীনা সনদ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০১৩
৩৬। Glimoses of World History-জওহরলাল নেহেরু
৩৭। Witness to Surrender- Siddiq Salik
৩৮। The Chief Prosecutor Versus Motiur Rahman Nizami ICT-BD Case No.03 OF 2011
৩৯। দৈনিক পূর্বদেশ-পত্রিকা [কৃতজ্ঞতায়ঃ আরিফ রহমান]
৪০। দৈনিক পাকিস্তান-পত্রিকা [কৃতজ্ঞতায়ঃ মুক্তিযুদ্ধই-আর্কাইভ ট্রাষ্ট]
৪১। DAWN-1971 Jihad: prints ads from west Pakistan [16/12/2015]
৪২। The New York Times Archive.[কৃতজ্ঞতায়ঃ মুক্তিযুদ্ধই-আর্কাইভ ট্রাষ্ট]
৪৩। 8 Stages of Genocide-Dr. Gregory H. Stanton
৪৪। Images of propaganda: World War I and World War II Posters-Mary M. Rider
৪৫। An Analysis of American Propaganda in World War II and the Vietnam War-Connor Foley Follow, Bridgewater State University –রিসার্চ আর্টিকেল
৪৬। মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনে পাকিস্তানি মানস- সাব্বির হোসাইন
৪৭। Wikipedia


জয় বাংলাদেশ
জয় মুক্তি বাহিণী
বাংলাদেশের মুক্তির অদম্য স্পৃহাকে কিছুতেই নিভিয়ে দেওয়া যাবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যাতে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সম্মানের সাথে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা সবাই প্রয়োজন হলে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাই আমাদেরকে কেউ পদানত করে রাখতে পারবে না।
যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা আমাদের মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছি ততদিন আমাদের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।
– শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ
সংযোগ বিভাগ কর্তৃক মুদ্রিত

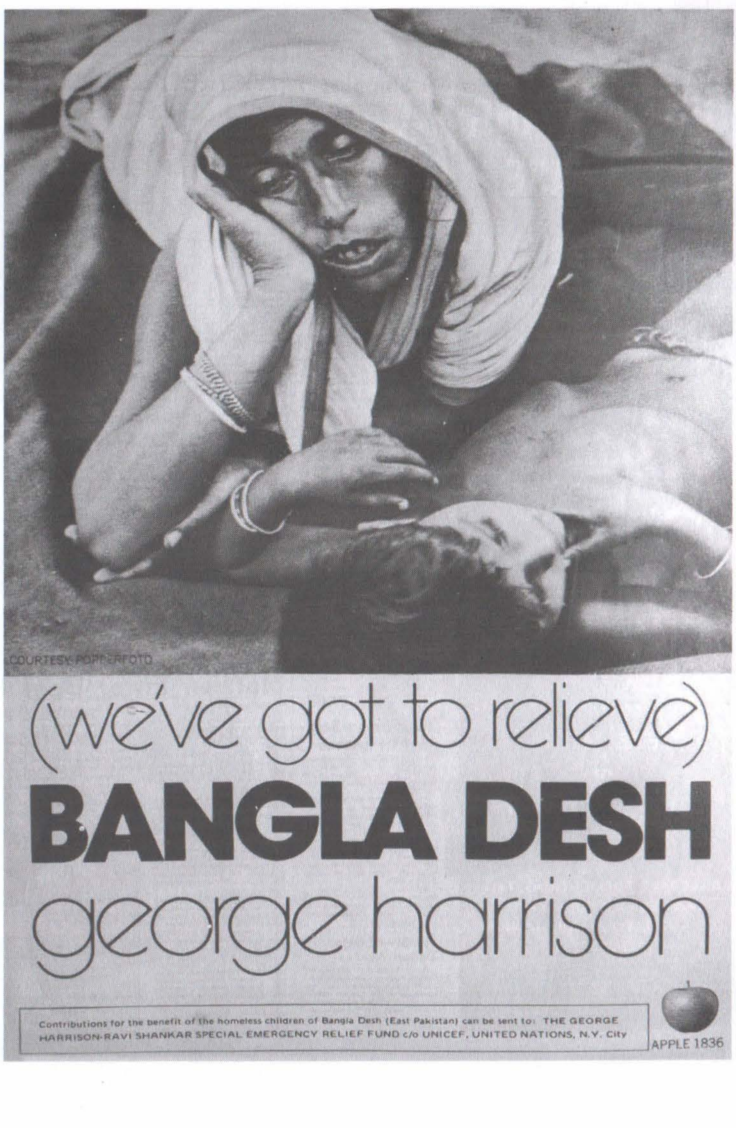


স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অদম্য মনোবল ও দুর্বার সাহস তাকে শক্তি যোগাচ্ছে। প্রতিদিন বুকের রক্ত সিঞ্চন ক'রে তারা লালন করছে এই নতুন জাতিসত্তাকে।
পৃথিবীর কোন শক্তিই এই নতুন জাতিকে বিলোপ করতে পারবে না। দু'দিন আগেই হোক বা পরেই হোক পৃথিবীর ছোট বড় সকল শক্তিই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অবশ্যই স্থান দেবে।
তাজউদ্দীন আহমেদ
প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশ
বিজয় আমাদেরই
বাংলাদেশ গণসাধারণতন্ত্র সরকারের
জন সংযোগ বিভাগ কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত


পাকিস্তান আজ মৃত
পাকিস্তান আজ মৃত। শহীদের শবের পাহাড়ের নীচে পাকিস্তানের কবর হয়েছে। ইয়াহিয়ার হানাদার সেনাবাহিনী বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে এবং এ হত্যালীলা পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচনা করেছে।
পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যার আশ্রয় নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান নিজ হাতে পাকিস্তানের কবর খুঁড়েছে, এ কথা তার বোঝা উচিত।
—তাজউদ্দীন আহমেদ
প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশ
বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের
জন সংযোগ বিভাগ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ইয়াহিয়া
হিটলারকেও
লজ্জা দিয়েছে
এই বীভৎস নিধনযজ্ঞ, এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের সামনে অন্য সব নৃশংসতাই ম্লান হয়ে গেছে।
গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার কলঙ্কময় ইতিহাস খুঁজলে হিটলারের নিধন শিবির অথবা চেঙ্গিস খান বা তৈমুরলঙের নৃশংসতার কাহিনীতেও এরূপ হত্যাকাণ্ডের মিল পাওয়া দুষ্কর হবে।
দি রিলিজিয়ন অব ক্যারাকাস,
ক্যাথলিক দৈনিক, ভেনেজুয়েলা


COURTESY POPPERFOTO
(we've got to relieve)
BANGLA DESH
george harrison
Contributions for the benefit of the homeless children of Bangla Desh (East Pakistan) can be sent to: THE GEORGE HARRISON-RAVI SHANKAR SPECIAL EMERGENCY RELIEF FUND c/o UNICEF, UNITED NATIONS, N.Y. City
APPLE 1836